বারবাঁধ আজও সেই বীরবাঁধ। জায়গাটার চেহারাতে কোন কিছুই বদলিয়ে যায়নি। দূরে সেই ছোট পাহাড়, কাছে সেই শাল-মহুয়ার জঙ্গল। স্টেশনের মাথার উপর সেই টিনের চালা। জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে যে লিকলিকে জলের স্রোতটা কালো পাথরের চটানের গা কেটে কেটে আর খাত করে করে অনেক দূরের ধান-ক্ষেতের দিকে চলে গিয়েছে, বীরবাঁধের মানুষ তাকেই নদী বলে মনে করে। নদীর একটা নামও আছে—ভাসানি।

ভাসানি আজও সেই ভাসানি, যার জলের স্রোতে ফাল্গুনের শাল-ফুল ভেসে যায়।

এক বছর আগের ফাল্গুনে এই বীরবাঁধের মেয়ে সুমিতা ওই ভাসানির স্রোতের শালফুল দেখবার জন্য কালো পাহাড়ের চটানের উপর এসে বসেছিল। সুমিতার বাবা হেমন্তবাবু চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিলেন—ওই দেখ সুমি, শুধু শালফুল নয়, অনেক মহুয়াফুলও ভেসে যাচ্ছে।

দুটি মাস হল, এ-বছরের ফাল্গুন চলে গিয়েছে। কিন্তু ভাসানির স্রোতের শালফুল ও মহুয়াফুল দেখবার জন্য সুমিতা ও হেমন্তবাবু, বাপ ও মেয়ে দুজনের কেউই আর কালো পাহাড়ের চটানের উপর এসে দাঁড়ায়নি। কারণ, হেমন্তবাবু আজ আর সেই হেমন্তবাবু নন। সুমিতাও আজ আর ঠিক সেই সুমিতা নয়। বাপ ও মেয়ে, দুজনের জীবনের ধারাতে সেই কলরোল নেই। হেমন্তবাবুর আর চেঁচিয়ে হেসে ওঠবার ক্ষমতা নেই। সুমিতারও প্রাণে আর ভাসানির কিনারা ধরে ছুটোছুটি করে ও হাঁততালি দিয়ে ঘুঘুর দলকে উড়িয়ে দেবার উল্লাস নেই। কত তাড়াতাড়ি, মাত্র এক বছরের মধ্যে পাল্টে গেল বীরবাঁধের হেমন্তবাবুর ভাগ্যটা। সুমিতা ছাড়া হেমন্তবাবুর

যে আরও একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে, রাণু আর ভানু, দশ বছর বয়স আর আট বছর বয়স, তাদের প্রাণের মুখরতাও কত মৃদু হয়ে গিয়েছে। সকাল-বিকাল যখন-তখন চেঁচিয়ে হেসে ছড়া বলতো যে রাণু; সে রাণু একেবারে নীরব-নিথর হয়ে যখন-তখন বাড়ির বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে। ভানু তার লাল রঙের বলটাকে হাতে নিয়েও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর যেন হঠাৎ রাগ করে বলটাকে ঘুমন্ত বিড়ালটার দিকে এগিয়ে দেয়। বিকেলবেলা চারটের সময়, স্যামুয়েল সাহেবের গালাকুঠিতে যখন ঘণ্টা বাজে, তখন রেল-কলোনির প্রাইমারী স্কুলের বড়দিদি সুমিতা স্কুল-ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরে যায়। মাত্র একুশ বছর বয়সের একজন বড়দিদি, কিন্তু দেখে মনে হবে, ত্রিশ বছর বয়সের কোন বড়দিদি চিন্তাক্লান্ত একটি মুখ নিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে আনমনার মত চলে যাচ্ছে।

ঠিক কথা, বাড়ি ফিরে যাবার পথে একটু এদিকে-ওদিকে তাকালেই দেখতে পেত সুমিতা, ওরই মত কত একুশ বছর বয়স তখন প্রাণের দুরন্ত খুশির আবেগে ছুটোছুটি আর হাসাহাসি করছে। হরনাথবাবুর মেয়ে অঞ্জলি অবশ্য একটি ফ্রক-পরা মূর্তি, সুমিতার চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের ছোট। অঞ্জলি তাই সাইকেল নিয়ে পার্কের চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাইরের ঘরে বসে আর হারমনিয়ম বাজিয়ে গান গাইছে যে মণিকা, প্রিয়নাথবাবুর মেয়ে, সে তো সুমিতার চেয়ে অন্তত তিন বছর বেশি বয়সের, চব্বিশ বছর তো বটেই। পার্বতীবাবুর মেয়ে ওই যে অলকা, সে এখন আস্তাবলের চালার উপর দাঁড়িয়ে আর ছোটভাই মন্টুর হাত থেকে নাটাই কেড়ে নিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, তার বয়সও তো বাইশের কম নয়।

এদের সঙ্গে সুমিতার শুধু ওই বয়সেরই মিল কিংবা অমিল আছে, কিন্তু জীবনের মিল নেই, প্রাণেরও মিল নেই। কিন্তু ছিল একদিন। সবাই জানে, প্রাইমারী স্কুলের বড়দিদি এই সুমিতা, এই তো সেদিনও

এক বছর আগেও ট্রেনটা ভাল করে না থামতেই কামরার ভিতর থেকে ছুট্ করে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে পড়েছে আর দৌড়ে এসে রাণু আর ভানুর গলা জড়িয়ে ধরেছে। কামরার ভিতর থেকে হেমন্তবাবু চেঁচিয়ে উঠেছেন—হেই হেই, ও কী ও কী! কিন্তু ততক্ষণে নেমে পড়েছে সুমিতা। কলেজের ছুটির সময় পাটনা থেকে বীরবাঁধে ফিরে আসবার সময়, সুমিতা এই দুরন্ত কাণ্ডটি না করে ছাড়তো না। সবাই দেখেছে সেই দৃশ্য। অলকার মা একবার সুমিতার মা-র কাছে সুমিতার নামে বেশ নরম স্বরে নিন্দেটা করেই ফেলেছিলেন—আদরের মেয়েটি কিন্তু একটু বেশি দুরন্ত, মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলবেন চারুদি, ওরকম দুরন্তপনার বয়সটা এখন আর নেই।

বীরবাঁধের যে চারুদি, হেমন্তবাবুর স্ত্রী চারুবালা সেদিন চুপ করে মেয়ের দুরন্তপনার নিন্দে শুনেছিলেন, তিনি আজ আর নেই। তিনি থাকলে আজ দেখতে পেতেন, সেই দুরন্ত মেয়ে আজ কত স্তব্ধ ধীর স্থির আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

আসল কথাটা এই যে, চারুবালার মৃত্যুর পরে এই এক বছরের মধ্যে বীরবাঁধের হেমন্তবাবুর ভাগ্যটা, তাঁর ওই দুই মেয়ে আর এক ছেলের ভাগ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যেমন উদাস তেমনই বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে। ভাসানির স্রোতে ফাল্গুনের শাল আর মহুয়ার ফুল যেমন ভেসে আসে, একের পর এক, তেমনই কোথা থেকে, যেন কোন্ এক অজানা অন্ধকারের ভয়াল স্রোতের সঙ্গে একের পর এক-একটা দুর্ভাগ্য ভেসে এসে হেমন্তবাবুর জীবন ও তাঁর এই ঘরের জীবনের উপর লুটিয়ে পড়ল।

বিকেলবেলা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসবার পথে একবার স্টেশনের কাছে সড়কের কিনারায় সব্জী বাজারটা ঘুরে যায় সুমিতা। অনেক দরাদরি করে, পয়সারও অনেক হিসেব করে, একটা কাঁচা-পেঁপে, আর বড় জোর কিছু মিঠে আলু ও একফালি কুমড়ো কিনে নিতে হয়। ভানুর জন্য একটা আতা কেনবার জন্য প্রাণটা ছটফট

করে, দশটা পয়সা হাতে তুলে নিয়েও হাতটাকে সামলে ফেলে সুমিতা। না, আজ থাক্। আসছে মাসে মাইনে পাওয়ার পর না হয়…।

এই সুমিতাই না এক বছর আগে রাণু আর ভানুকে সঙ্গে নিয়ে যখন-তখন স্টেশনে আসতো! এই সুমিতাই না সেদিন স্টেশনের স্টল থেকে যা-খুশি ও যা-ইচ্ছে সবই কিনতো! আইসক্রীম আর কেক, প্লাস্টিকের পুতুল আর রঙীন গালার শিব-দুর্গা, গরম চানাচুর আর ক্ষীরমোহন।

মা বেঁচে থাকতে রান্না কাকে বলে তা জানতো না, জানবার দরকার হয়নি, জানতে চেষ্টাও করেনি সুমিতা। আজ কিন্তু নিজের হাতে উনুন ধরিয়ে সুমিতাই দুবেলা রান্না করে। হেমন্তবাবু রাত্রিতে কিছুই খান না। তার মানে, খেতে চান না। সুমিতাকে অনেকবার বলে বলে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন হেমন্তবাবু—আমার মত রোগীর পক্ষে রাত্রিতে কিছুই না খাওয়া ভাল। কিন্তু সুমিতা মাঝে মাঝে বুদ্ধি করে রাত্রিতে কাঁচাপেঁপের হালুয়া তৈরী করে। কারণ, মনে করতে পারে সুমিতা, মা বেঁচে থাকতে বাবা প্রায় যখন-তখন হেসে হেসে মা'কে বলতো—আজ আমার একটু কাঁচাপেঁপের হালুয়া হলে ভাল হয়।

সুমিতার অনুরোধের চাপে পড়ে রাত্রিতে কাঁচাপেঁপের হালুয়া যদি বা একটু মুখে দেন হেমন্তবাবু, কিন্তু রুটি কিছুতেই না। ডাক্তার বলেছেন, দুধ ও ফল একটু বেশি করে খেতে হবে। হেমন্তবাবু হেসেছেন, ওটা ডাক্তারদের স্বভাবের একটা রোগের কথা। ওসব কথার কোন মানে হয় না। দুপুরে দুমুঠো গরম ভাত আর একটা সেদ্ধ ঢেঁড়স কিংবা ঝিঙে হলেই আমার চলে যাবে। আর সন্ধ্যাবেলা এক পেয়ালা চিনি-ছাড়া চা। ' ডাক্তার না বলুক, আমি জানি, এরকম এক পেয়ালা চিনি-ছাড়া চা সন্ধ্যাবেলাতে আমার এই রোগের শরীরের পক্ষে অমৃতের মত বস্তু। তুই কখ্খনো

আমার খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবি না, একটুও ব্যস্ত হবি না, সুমি।

সন্ধ্যাবেলা এক পেয়ালা চা খেয়ে শুয়ে পড়েন হেমন্তবাবু। জীর্ণ শীর্ণ ও করুণ একটা শরীর নিস্পন্দ হয়ে বিছানার উপর পড়ে থাকে। এক বছরের মধ্যে রোগে কাহিল হয়ে বলিষ্ঠ মানুষটার চেহারা থেকে সব মেদ মাংস ও রক্ত যেন ঝরে পড়ে গিয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, ভয়ানক রক্তশূন্যতা। তার উপর আরও কত উপসর্গ। হার্ট খারাপ, লিভারে জোর নেই। চারুবালার মৃত্যুর পর একদিন হঠাৎ বার বার পাঁচবার বমি করবার পর সেই যে শুয়ে পড়লেন হেমন্তবাবু, তারপর আর ভাল করে উঠে দাঁড়াবার শক্তিই পেলেন না। পক্ষাঘাত, ডান হাত-পা অসাড় হয়ে গেল।

রোগ এল, তাই কারবারটা গেল। কী করেই বা করবেন? কলকাতার এক সিন্ধী রপ্তানীওয়ালার এজেন্ট হয়ে অভ্র কিনতেন আর কলকাতাতে পাঠিয়ে দিতেন হেমন্তবাবু। খুবই ছুটোছুটি আর ব্যস্ততার কাজ। মাসের মধ্যে অন্তত দশটা দিন জঙ্গলের ভিতর খনিতে খনিতে গিয়ে, কখনও বা কোডারমা ও গিরিডির অভ্রওয়ালাদের গদিতে গিয়ে মাল খরিদ করতে হতো। বীরবাঁধের এই বাড়ির কাছে ওই যে পলাশ গাছটা, যেখানে একটা ঘরের একদিকের দেয়াল ধসে পড়ে গিয়েছে, সেখানে ছিল হেমন্তবাবুরই কেনা অভ্র ছুরি করবার কারখানা। পঁচিশজন মেয়ে ও পুরুষ মজুর ওই ঘরের ভিতরে ও কারখানায় বসে কাজ করতো। অভ্রের ছাঁট আর কুচি আজও একটা স্তূপ হয়ে পলাশতলার কাছে পড়ে আছে। রাত্রিতে জ্যোৎস্না থাকলে ওই অভ্রের ছাঁট আর কুচি জ্বলজ্বল করে হাসে। হীরের কুচিও বোধহয় ওইরকম হাসে। কিন্তু কে না জানে, ওটা হেমন্তবাবুর অধঃপতিত ভাগ্যটার উপর একটা অকরুণ ঠাট্টার হাসি। রোগে ধরবার পর আর কারবারের কাজ করতে পারলেন না হেমন্তবাবু। বছরে অন্তত হাজার সাত-

আট টাকা কমিশন পেতেন। সিন্ধী রপ্তানীওয়ালা পাই-পাই হিসেব করে হেমন্তবাবুর প্রাপ্য কমিশন ছাড়া আরও অনেক কিছু উপহার দিতেন। সিল্কের থান, বাক্সভরা আপেল ও কিসমিস, আর পশমী কাপড়। কিন্তু আজ ওসব যেন স্বপ্নে শোনা গল্পের উপহার। এক বছর আগে, সেই যে শরীরটাকে রোগে ধরল, হেমন্তবাবুর ভাগ্যটাকেও রোগে ধরল, তারপর থেকে রোজগার নেই, রোজগার করবার সুযোগ শক্তি আর উপায়ও নেই। হেমন্তবাবুর রোগের শরীরটার মত রুগ্ন ভাগ্যটাও যেন শয্যাশায়ী হয়েছে। আজ সুমিতার চাকরির ওই ষাট টাকার মাইনেটাই হেমন্তবাবুর এই সংসারের চারটি প্রাণীর ক্ষুধার খোরাক যুগিয়ে থাকে।

রাত্রিবেলা, রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করবার আগে যখন ঘরের মেঝে ধুয়ে দেবার জন্য জল ঢালে আর ঝাঁটা চালায় সুমিতা, তখন শয্যাশায়ী হেমন্তবাবুর নিথর রুগ্ন শরীরটা যেন আচমকা একটা মোচড় দিয়ে কেঁপে ওঠে। যেন রক্তহীন হেমন্তবাবুর পাঁজরের হাড়ের উপর একটা জ্বালা হঠাৎ ছোবল দিয়েছে। ওঃ, হেমন্তবাবুর গলার ভিতর থেকে একটা করুণ শব্দ ডুকরে ওঠে।

রাত যখন গভীর হয়, পলাশের পাতাতে বাদুড়ের ঝুপঝাপ হুটোপাটির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ যখন আর থাকে না, তখন একটা শব্দ শুনে সুমিতারই ঘুম আচমকা ভেঙে যায়। বিছানা থেকে উঠেই বুঝতে পারে সুমিতা, পাশের ঘরে খুট্ খুট্ শব্দ হচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠিক পাশের ঘরে। হেমন্তবাবুর ওই ভয়ানক রুগ্ন রক্তহীন পঙ্গু শরীরটা বিছানা থেকে উঠে এসে চারুবালার ফটোটার কাছে এসে বসেছে। আলো জ্বেলে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকেই ডাক দেয় সুমিতা—আমাকে ডাকলে না কেন?

বিস্ময়ের প্রশ্ন নয়। সুমিতার কাছে নতুন ঘটনা কিংবা নতুন দৃশ্য নয়। জানে সুমিতা, দেখে দেখে সুমিতার চোখে দৃশ্যটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, হেমন্তবাবু এক-একদিন হঠাৎ এভাবে উঠে এসে এই

ঘরে চারুবালার ফটোর কাছে বসে থাকেন। এরকম করে উঠে আসবার শক্তি কেমন করে আর কোথা থেকে যে পান, কে জানে!

সুমিতার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হেমন্তবাবু অন্য কথা বলেন—তোর মা কিন্তু খুবই চালাক মানুষ। দেখলি তো, কেমন করে কত সহজে আমাকে একটুও বুঝতে না দিয়ে সরে পড়ল!

বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন হেমন্তবাবু—কি রে সুমি, তুইও কি সন্দেহ করছিস যে, আমার মাথাটা খারাপ হয়েছে?

—তুমি আবার মিছিমিছি একথা কেন বলছো?

হেমন্তবাবু হাসতে চেষ্টা করেন—কা আশ্চর্য, কী অদ্ভুত ব্যাপার, শত ডাকাডাকি করলেও তোর মা আর এখানে আসবে না। আমি শুধু ভাবি, কেমন করে এটা সম্ভব হয়! তুই ও-ঘরে ঘুমোচ্ছিস, রাণু আর ভানু ঘুমিয়ে রয়েছে, অথচ তোর মা একটিবারও তোদের দেখতে চাইবে না, দেখবার জন্য একটিবারও আসবে না, এ কী করে হয়? দেখা না দিক, অন্তত একটা সাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে তো যে, সে আছে, সবাইকে দেখছে। ছেলেমেয়ের জন্য এত মায়া, এত উদ্বেগ, সে-সব গেল কোথায়? তোর মা'র উপর কিন্তু আমার বেশ রাগই হয়, সুমি।

এক বছর আগের সেই রাতটা। গিরিডি থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে বীরবাঁধে ফিরে এসে, রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর, রাণু আর ভানু যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন বাইরের বারান্দাতে দুই চেয়ারে পাশাপাশি বসে কত গল্পই না করেছিলেন হেমন্তবাবু আর চারুবালা। শুধু কি গল্প? শুধু কি গিরিডির পাঁড়েজীর হোটেলের লেবুর ঝোলের গল্প? একটা কল্পনার গল্পও মুখর হয়ে উঠেছিল। এবার সুমিতার বিয়ের জন্য একটু চেষ্টা শুরু করা দরকার। ভাল বংশের ছেলে হবে, স্বাস্থ্যটা ভাল হবে, রোজগার মোটামুটি ভাল হবে—কিন্তু—চারুবালা বললেন—কিন্তু আমার মেয়ে যেমন সুন্দরী, মেয়ের বরেরও তেমনটি সুন্দর হওয়া চাই।

—নিশ্চয়। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি যেমন-তেমন চেহারার কোন পাত্রের কাছে মেয়েকে কখনই দেব না।

—টাকার যোগাড় রেখেছো তো?

—না, তবে চিন্তা নেই। এ বছরে অভ্রের বাজার যেরকম ভাল, গত বিশ বছরে সেরকম ভাল কখনও হয়নি। আশা করছি, এ বছরের কমিশন খুব ভালই পাওয়া যাবে। বছরের খরচ মিটিয়ে দিয়েও অন্তত পাঁচ-সাত হাজার টাকা হাতে থাকবে।

—তার মানে, বছরের শেষে মেয়ের বিয়ে হতে পারে, তার আগে হবে না।

হেমন্তবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কেন হবে না? ভাল পাত্র যদি পেয়ে যাই, আর বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যায়, তবে টাকা ধার করব। পাঁচ-সাত হাজার টাকা ধার পেতে আমার অসুবিধে নেই।

সোনার দর এখন কত? যদি বেনারস থেকে শাড়ি আনাতে হয়, তবে তারও একটা ব্যবস্থা হতে পারে। মহীতোষ এখন বেনারসে আছে। চিঠি লিখে জানালেই ত্ব'তিনটে ভাল শাড়ি বাছাই করে আর কিনে পাঠিয়ে দিতে পারবে মহীতোষ। কলকাতা থেকে মাছ না আনলেও চলবে, এখানেই মুকুটধারীবাবুর পুকুর থেকে প্রচুর রুই-কাতলা পাওয়া যাবে। মুকুটধারীবাবু বোধহয় মাছের দাম নিতে চাইবেন না। কাজেই, শুধু জেলে লাগিয়ে মাছ তোলবার খরচ।

সুমিতার বিয়েতে আপনজন আর কুটুম্বদের মধ্যে কে কে আসবেন, কারা আসতে পারবে কিংবা পারবে না, তাদের কথাও আলোচনা করতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। তখন পলাশের মাথার উপর চাঁদ ভেসে উঠেছে। ভাসানির জলের কলকল শব্দ খুব স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

চারুবালার ইচ্ছা, মাধবপুরের বউদি বিয়ের একমাস আগেই এখানে এসে থাকবেন। মহীতোষ ওর মিলিটারী চাকরির কঠিন

বাঁধন থেকে দু'তিন দিনের জন্যও ছাড়া পেতে পারবে কিনা ঠিক নেই। কিন্তু মহীতোষের বউ বেলা নিশ্চয় আসবে, বিয়ের পরেও দশটা দিন থাকবে। বেলার বোধহয় এখন সবসুদ্ধ চারটি, বড়টি মেয়ে, তারপর তিনটিই ছেলে।

প্রিয়দা, রেল-কলোনির প্রিয়নাথবাবু যখন আছেন, তখন আর-এক দিকের কোন চিন্তা নেই। রান্না করবার ভাল পাঁড়ে যোগাড় করবার ঝঞ্ঝাট থেকে শুরু করে পোলাও আর কালিয়ার স্বাদ চমৎকার করে তোলবার কাজ পর্যন্ত, সবই প্রিয়দার তদারকীতে খুব সহজেই হয়ে যাবে। আমি একটুও চিন্তা করি না, চারু। তোমার সুমির বিয়েতে কাজের কোন বাধা বা অসুবিধে হবে না।

সে রাতেই, শেষ প্রহরে কাঁচা সোনার মত রঙের চাঁদটা যখন পলাশের মাথার উপর থেকে নেমে শালজঙ্গলের ছায়ারেখার উপর ঝুঁকে পড়েছে, একটা কাকও ডেকে উঠেছে, তখন ঘুমের মধ্যেই তিন-চার বার কাশলেন চারুবালা। একবার ধড়ফড় করে জেগে উঠলেন আর বুকে হাত চেপে বিছানার উপর বসে রইলেন।

সকাল হতেই বমির শব্দ শুনে চমকে উঠলেন হেমন্তবাবু। দেখতে পেলেন, পর-পর পাঁচবার বমি করলেন চারুবালা। অদ্ভুত বমি; অদ্ভুত শব্দ করে দু-চার ফোঁটা জল উদ্গারের সঙ্গে বের হয়ে এল। নীল হয়ে গেল চারুবালার মুখটা। চোখ দুটো অপলক হয়ে তাকিয়ে রইল, যেন দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না চারুবালা।—তুমি কোথায়? রাণু আর ভানু কি জেগেছে? সুমি কবে আসবে? তোমাদের বোধহয় আর দেখতে পাব না।

সেই যে চোখ বন্ধ করলেন চারুবালা, আর খুললেন না। পাটনাতে কলেজের হোস্টেলের ঘরে সকালবেলাতে ঘুম-ভাঙা চোখ নিয়ে যখন চারুবালার কাছে চিঠি লেখবার কথা ভাবছে সুমিতা, তখন বীরবাঁধের সকালবেলাতে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়েছেন চারুবালা। সুমিতা ভেবেছিল, মা'কে এবার স্পষ্ট করে দু-চারটে শক্ত কথা লিখতেই

হবে। সুমিত্রা নামে যে একটা মেয়ে এই পৃথিবীতে কোথাও এখন আছে, সেটা কি তোমার একবারও মনে পড়ে? এগার দিন হয়ে গেল, তোমার একটা চিঠি পেলাম না কেন?

আজকাল মাঝরাতে বিছানা থেকে উঠে আর পাশের ঘরে এসে চারুবালার ফটোর দিকে যে-রকম করে তাকিয়ে থাকেন হেমন্তবাবু, সেদিনও ঠিক সেরকম করে তাকিয়ে চারুবালার মুখটাকে দেখেছিলেন। বাঃ, লালপেড়ে শাড়ি পরে, আর সিঁথিতে সিঁদুর ছড়িয়ে আর বুকের ওপর একগাদা সাদাফুল নিয়ে কোথাও কোন মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছে নাকি চারু? বেশ, খুব দেখালে চারু! খুব ঠাট্টার খেলা খেলে নিয়ে এখন চলে যাচ্ছ। প্রিয়নাথবাবু শুনতে চেষ্টা করেছিলেন, বিড় বিড় করে কী কথা বলছে হেমন্ত। কিন্তু শুনতে পাননি। কিন্তু দেখেছিলেন যে, হেমন্তর চোখে জল নেই, বুক-কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস নেই, মুখে করুণ আক্ষেপের একটি শব্দও নেই। শুধু একটি কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন হেমন্তবাবু—আশ্চর্য! কিন্তু প্রিয়নাথবাবু আজ বুঝতে পেরেছেন, সেদিন ভয়ানক একটা দীর্ঘশ্বাস হেমন্তর বুকের ভিতরে নিশ্চয় আটকে গিয়েছিল, ফুসফুসটা বুঝি রক্তে ভেসে গিয়েছিল। তা না হলে এত শিগ্‌গীর, মাত্র একটি মাসের মধ্যেই এরকম ভয়ানক একটা রোগে হেমন্তকে ধরে ফেলতো না।

ঘটনা আর সমস্যাটা শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে আর কেমন চেহারা নিয়ে দাঁড়াবে সেটাও বুঝতে পেরেছিলেন প্রিয়নাথবাবু। এ বছরের অভ্র খরিদের কাজ শুরু করেনি হেমন্ত; সুতরাং সিন্ধী রপ্তানীওয়ালার কাছ থেকে কোন কমিশন পাওয়া হয়নি। দুঃখের খবরটা শুনতে পেয়ে সিন্ধী রপ্তানীওয়ালা অবশ্য দুশো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই টাকাতে চারুবালার শ্রাদ্ধের আনুষ্ঠানিক কাজ মোটামুটি হয়েই গিয়েছে। কিন্তু তারপর? তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে হেমন্তর সংসারের দিনগুলি চলবে কি করে?

পাটনার কলেজের হোস্টেলে সুমিতার আর যাওয়া হল না। হেমন্তবাবুর এই বাড়ির রান্নাঘরে যে-মানুষটিকে এতদিন ব্যস্ত হয়ে থাকতে দেখা যেত, সে তো নেই। এখন এই রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে কাজ করে সুমিতা। চারুবালার মৃত্যুর পর তিনটে মাসও পার হয়নি, একদিন চারুবালার গলার হার আর হাতের একজোড়া রুলি নিয়ে প্রিয়নাথবাবুর বাড়িতে এসে ডাক দিল সুমিতা—জেঠিমা ?

—এস সুমিতা। প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রী, মণিকার মা এগিয়ে এসে সুমিতার মাথাতে হাত বোলাতে থাকেন। সুমিতা বলে—এগুলি রেখে আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিন জেঠিমা।

—ও কী! ছি ছি! তুমি এসব জিনিস আমার কাছে নিয়ে এসেছো কেন ? না না, আমার কাছে ওসব জিনিস বাঁধা রাখতে হবে না। তুমি বাড়ি যাও। তোমার জেঠামশাইকে বলছি, তিনি গিয়ে টাকা দিয়ে আসবেন।

ছুটো মাস প্রিয়নাথবাবু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তারপর, একদিন একটা স্থায়ী উপায় করে দিলেন। রেল-কলোনিতে একটা প্রাইমারী স্কুল করবার জন্য যে চেষ্টা করতে হয়েছিল, সে চেষ্টা সফল হয়েছে। স্কুল-কমিটি চাঁদা তুলে প্রতিমাসে অন্তত ষাট টাকা তুলবেন, আর রেল কোম্পানী দেবেন টীচারের প্রতি মাসের মাইনে হিসাবে ষাট টাকা। এই সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলে না। হেমন্তর মেয়ে সুমিতাকে স্কুলের টীচারের কাজটা পাইয়ে দিতে বিশেষ কোন অসুবিধে বোধ করেননি প্রিয়নাথবাবু। কোন বাধা ছিল না। স্কুল-কমিটির সকলেই একবাক্যে অনুমোদন করেছিল, সুমিতাই এই স্কুলের টীচার হোক।

লাল টালির চালা, তার উপর অপরাজিতার লতা। রঙীন ফড়িং উড়ে উড়ে অপরাজিতার ফুলের উপর বসে আর ফড় ফড় করে পাখা কাঁপায়। অদ্ভুত দেখায়, এরকম চেহারার একটি স্কুলঘরের সিঁড়ির

উপর দাঁড়িয়ে আছে একুশ বছর বয়সের এক বড়দি। যদিও ছোটদি নামে কোন টীচার নেই, তবু সুমিতা ওই বড়দি নামটা পেয়ে গিয়েছে। স্কুল-কমিটি নয়, প্রিয়নাথবাবুর সবচেয়ে ছোট মেয়েটা, যার নাম কণিকা, সে-ই স্কুলের প্রতিষ্ঠার দিনে বেঞ্চিতে বসে সবার আগে হেসে আর চেঁচিয়ে ডেকে ফেলেছিল—বড়দি!

বিকেল বেলা স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফেরবার পথটা রোজই অবশ্য আনমনার মত আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যেতে পারে না সুমিতা।—সুমিতা, খবর ভাল তো? জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কথা বলে ফেলেন রঙ্গনাথনবাবুর বাঙালী স্ত্রী কল্যাণী।—হ্যাঁ, ভাল। হেসে হেসে জবাব দেয়, মুখ তুলে তাকায় সুমিতা।

কল্যাণী যদিও আর কোন কথা জিজ্ঞেসা করেন না, কিন্তু যেন মুগ্ধ হয়ে দুই চোখ অপলক করে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। শুধু মুগ্ধ হবার কথা নয়, আশ্চর্য হবারও কথা। সুমিতার চেহারাতে কোন খুঁত আছে কি? রংটা কি আর-একটু ফরসা হলে ভাল হতো? না, একটুও ভাল হতো না। নাক মুখ চোখ, দুই ঠোঁট আর চিবুক, সবই যেন ছাঁদে ছাঁদে মিলে-মিশে গিয়ে একটি চমৎকার শোভা হয়ে ঢলঢল করছে। যেমন এলো চুলে, তেমনই খোঁপাতে ও বেণীতে সুমিতাকে কী সুন্দর মানায়!

এই এক বছরের মধ্যে কত রকমেরই না আঘাত এসে হেমন্তবাবুর এই বাড়িটার প্রাণে এক-একটা দীর্ঘশ্বাসের ব্যথা রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে। রাণুর পোষা ময়নাটা কবে আর কেমন করে পালিয়ে গেল, টেরই পায়নি রাণু। একদিন ছোলা খাওয়াতে এসে দেখতে পেয়েছে রাণু, খাঁচার দরজাটা খোলা। খাঁচাতে ময়নাটা নেই। কে খুলে দিল খাঁচার দরজা? কেঁদে ফেলেছিল রাণু। পলাশের মাথার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সেই ময়নাকে দেখতে পায়নি। এই ময়নাটাও ঠিক মা-র মত চালাক। না বলে-কয়ে মা কখন যে পালিয়ে গেল, বুঝতে পারেনি রাণু। সেই সকালে

ডাক্তারের কাছ থেকে চারুবালার মৃত্যুর খবর পেয়ে তখনি ছুটে এসেছিলেন প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রী। রাণু আর ভানুকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, মিথ্যে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তখুনি নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা হলে যখন হেমন্তবাবুর বাড়ির বারান্দাতে একটা বাতি মিট মিট করে জ্বলছিল, তখন প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রী রাণু আর ভানুকে দিয়ে গেলেন। রাণু চেঁচিয়ে ডাক দিল— মা, তুমি কোথায়? কোন্ ঘরে?

রঘুর মা রাণুর গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল—মা নেই, মা চলে গিয়েছে!

—কোথায় গিয়েছে?

রঘুর মা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে—আমি জানি না রে বেটি, ভগবান জানেন।

কী ভয়ানক রাগ করেছিল রাণু। ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গিয়ে, ওই ঘরের ভিতর ঢুকে, চারুবালার ফটোর উপর একটা ঘুষি মেরে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল—তুমি মিথ্যুক, তুমি কেন আমাকে না বলে চলে গেলে?

এত রাগ করলেও রাণু খুব বিস্মিত। কালই বিকেলবেলা কত গল্প করে আর কত আদর করে রাণুর বিনুনী বেঁধে দিয়েছিলেন চারুবালা। এবার পুজোর সময় মাধবপুরের মামাবাড়িতে যাওয়া হবে, চারুবালার কথা শুনে কত খুশি হয়েছিল রাণু। মাধবপুরের মামাবাড়িতে মস্তবড় পুকুর আছে, সে পুকুরে লাল শালুক ফোটে আর সাদা হাঁস সারাদিন খেলা করে সাঁতার দেয়। কী আশ্চর্য, মা কেন এরকম একটা মিথ্যে কথা বলে দিয়ে পালিয়ে গেল? কোথায় গেল? কি দরকার ছিল মিথ্যে কথা বলবার?

আর, আট বছর বয়স এই ভানু, যার বয়স সেদিন ছিল সাত বছর, তার রাগের আর কান্নার যুক্তি ও বুদ্ধিটা হেমন্তবাবুকেই চেপে ধরেছিল। হেমন্তবাবুর হাত চেপে ধরে ভানু চেঁচিয়ে উঠেছিল—

তুমি জান, তুমি বল, তুমি আমাকে না বলে মা'কে কোথায় পাঠিয়েছো ?

শোনপুরের মেলা থেকে যে টাট্টু ঘোড়াটাকে কিনে বীরবাঁধে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বেনারসের মহীতোষ, ভানুর প্রিয় প্রাণী সেই রামু একদিন হঠাৎ মাটির ঘাসের উপর চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল, চার পা ছুঁড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করলো, তারপর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। মস্ত বড় পাখা ছড়িয়ে আর লম্বা গলা নিয়ে ভয়ানক বিশ্রী চেহারার একটা শকুন হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে রামুর মাথাটার উপর বসলো। শকুনটাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য কত ঢিল ছুঁড়েছে ভানু। কিন্তু শকুনটা যেতেই চায় না, ভানুর ঢিলকে একটুও ভয় পায় না। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল ভানু, শকুনটা রামুর চোখের উপর একটা ঠোকর দিয়েছে।

নিজের হাতে পুঁতেছিলেন চারুবালা, স্থলকমলের দুটো চারা। সে চারাগাছ বড় হয়ে তিন বছর আগেই ফুল ফুটিয়েছে। সকালবেলা সাদা হয়ে ফোটে, আর রোদ উঠলেই লাল হয়ে যায়, দেখতে কী সুন্দর আর কতবড় এক-একটা ফুল। ঝড় ছিল না, তবু দুপুর বেলার বাতাসের সামান্য একটা দোলা সহ্য করতে গিয়ে স্থলকমলের গাছ দুটো কাৎ হয়ে আর ভেঙে পড়ে গেল। কী ব্যাপার ? সুমিতা কাছে গিয়ে দেখতে পায় আর চমকে ওঠে, পিঁপড়েতে গাছ দুটোর শিকড় একেবারে নিঃশেষ করে খেয়ে ফেলেছে। কে জানে কবে কেন কেমন করে স্থলকমলের শিকড়ে পিঁপড়ে লেগেছিল !

সেই যে কবে, চারুবালার মৃত্যুর পর দুমাসের মধ্যে দুটো চিঠি লিখেছিলেন মাধবপুরের মেজমামী, তারপর আর কোন চিঠি লেখেননি। হেমন্তবাবুর শরীরের অবস্থা আর রোগের খবর জানিয়ে মেজমামাকে তিনটে চিঠি লিখেছিল সুমিতা। আশ্চর্যই বলতে হবে, কোন কারণ ভেবে পায় না সুমিতা, মেজমামা সেই তিন চিঠির

একটিরও উত্তর দেননি। মহীতোষ কাকারই বা কী হল? এখন তো দানাপুরে আছেন মহীতোষ কাকা। দানাপুর থেকে হাওড়া যেতে এক্সপ্রেস ট্রেন তো এই বীরবাঁধ হয়েই যায়। বীরবাঁধে তিনটে মিনিট থামেও এই এক্সপ্রেস। তবু মহীতোষ কাকা একবার এখানে এসে দেখা দিতে ও দেখে যেতে পারলেন না কেন? হেমন্তবাবুর কঠিন অসুখের খবর দিয়ে মহীতোষ কাকাকেও তিনটে চিঠি দিয়েছিল সুমিতা, কিন্তু চিঠিগুলো কোথায় চলে গেল কে জানে? সুমিতার কান্নার ভাষা দিয়ে ভরানো সেই তিনটে চিঠি পেয়েও মহীতোষ কাকা এখানে একবার আসবেন না, এটা কী করে সম্ভব?

ভাসানির জলের স্রোতে চারুবালার চিতার ছাই ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে হেমন্তবাবুর এই বাড়িটার সব ক'টি প্রাণের হাসি ও আনন্দের কলরব ছাই হয়ে ভেসে গিয়েছে। সুমিতার তো নয়ই, ছোট্ট ওই রাণু আর ভানুর মুখে সারাদিনের মধ্যে খুশি হাসির কাকলী একটিবারও কি বেজে ওঠে? হ্যাঁ, যেন ভুল করে এক-একবার হেসে ওঠে ভানু; শালিকের ধমকের কিচির-মিচির হঠাৎ শুনে চমকে উঠে আর দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল কাঠবিড়ালী। কিন্তু সেই মুহূর্তে আবার গম্ভীর হয়ে যায়, এইটুকু ছেলের ওই কচিমুখ।

আজ বলতে পারা যায়, হেমন্তবাবুর এই বাড়ি যেন চারুবালার প্রাণের সব সাধ আশা স্বপ্ন ও কল্পনার শ্মশান। আত্মা যদি থাকে, আর সেই আত্মার দুটো চোখ যদি থাকে, তবে আজ দেখতে পাবেন চারুবালা, তাঁর কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়া অভ্যাস ছিল যে রাণুর, সে রাণু এখন উঠানের এক কোণে বসে কালিমাখা একটা পেতলের হাঁড়িকে ছাইমাজা করে পরিষ্কার করছে। ছাই ঘেঁটে ঘেঁটে জ্বলতে শুরু করেছে রাণুর ছোট্ট নরম হাতটা। কিন্তু সেজন্য কোন ব্যথা কি জ্বলছে চারুবালার বুকে?

বিছানার উপর বসে আর ফটোর দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করেন

হেমন্তবাবু।—না না, কোন মানে হয় না, তুমি সত্যিই সাংঘাতিক মানুষ। ছেলে-মেয়ের জন্য তোমার মনে সত্যিই কোন দয়া কিংবা মায়া ছিল কিনা সন্দেহ।

হতে পারে, হেমন্তবাবুর মনটাকেও রোগে ধরেছে। চারুবালার উপর রাগ করতে আর এ রকমের অভিযোগ করতে হেমন্তবাবুর বোধহয় ভালই লাগে। সত্যিই, যেন পাশের ঘরে চুপ করে বসে আছে চারুবালা, আর এ-ঘরে বসে হেমন্তবাবু তাঁর যত রাগের কথা আর অভিযোগের কথা চারুবালাকে শোনাচ্ছেন। মন্দ কি? এক-এক সময় নিজের মনে হেসে ফেলেন হেমন্তবাবু, শুকনো ধুলোর মত উদাস ও বিবর্ণ হাসি। মনের রোগটা যদি চারুবালাকে কাছে ধরে রাখতে পারে, চলে যেতে না দেয়, তবে তো রোগটাকে একটা চমৎকার স্বাস্থ্য বলে মনে করাই উচিত।

নদী ভাসানি তার জলের ধারা নিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে দূরের ধান-ক্ষেতের দিকে চলে গিয়েছে। ভাসানির স্রোত নিশ্চয় জানে কোথায় কোনদিকে আরও কতদূরে যেতে হবে। কিন্তু সুমিতা কি জানে, সুমিতা কি কখনও চিন্তা করে কিংবা, কল্পনা করে দেখেছে, তার এই জীবনটার কোন গতি আছে কি নেই? সুমিতা কি আর স্বপ্নেও কোন দূরের ধান-ক্ষেতের সবুজ শোভা দেখতে পায়? অলকার মা অঞ্জলির মা-র সঙ্গে অবশ্য একটা কথা প্রায়ই আলোচনা করে।—আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে বিধুদি, সুমিতা ওর নিজের ভবিষ্যতের কথাটা একটুও ভাবে কি ভাবে না?

বিধুময়ী বলেন—ভাবে বইকি, কিন্তু ভেবেই বা কি করবে?

কিন্তু খুব ভুল ধারণা করেছেন অলকার মা আর অঞ্জলির মা। কোনদিন কোন মুহূর্তেও সুমিতা ওর নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। নিজের ভবিষ্যৎ আবার কি? ভিন্ন করে এরকম একটা ভবিষ্যৎ কখনও কল্পনা করে না সুমিতা। বাবার অসুখ সারিয়ে

তুলতে হবে, রাণু আর ভান্নুকে যত্ন করে বড় করে তুলতে হবে। তারপর একদিন রাণুর বিয়ে হয়ে যাবে, তারপর একদিন ভান্নুর বিয়ে। এ ছাড়া সুমিতার প্রাণে কোন সাধের আশা কিংবা কল্পনা নেই।

খুব বুঝতে পেরেছে সুমিতা, তার জীবনটা নদী ভাসানির মত একটা ধারা নয়, একটা দহ। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? মণিকা, অঞ্জলি আর অলকার জীবন যেমন একদিন উৎসব করে নতুন ঘরের জীবনে চলে যাবে, সুমিতা কোনদিনও সেরকম করে বীরবাঁধের বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাবে না।

দুর্ভাগ্যের মানুষ ওই হেমন্তবাবুর বড়মেয়ে সুমিতার জন্য যাঁদের মনে একটু বেশি মায়া আছে, শুধু তাঁরাই বোধহয় এরকম ধারণা করেন। কিন্তু সুমিতা নিজে এরকম কোন ধারণা করে কিনা সন্দেহ। জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখটাকে এত স্পষ্ট করে আর হিসেব করে বুঝে ওঠবার মত বয়সও তো নয় সুমিতার। কী আর কতটুকুই বা বুঝবে? সুমিতার মুখ দেখে বোঝা যায় না যে, নিজের জীবনের চেহারাটা ওর চোখে পড়ছে কি পড়ছে না। বুঝতে পারে না বোধহয়, ওর জীবনটা এখন ষাট টাকা মাইনের জন্য প্রতিদিন একই রকমের একঘেয়ে ব্যস্ততা নিয়ে খাটবার একটা কল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ কোনদিন, যেদিন এঁদের কেউ না কেউ হেমন্তবাবুর বাড়িতে এসে ঘরের ভিতরে এসেছেন ও বসেছেন, সেদিন তাঁরা একটু আশ্চর্য হয়ে বুঝেছেন যে, দহের জল যেন উৎসাহে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। কী অদ্ভুত খাটুনি খাটতে পারে মেয়েটা! হেমন্তবাবুর বাড়ির ভিতর এত বড় আঙিনার মাটিতে একটাও জংলা আগাছা নেই। এত বড় কুমড়ো মাচান বাঁধলো কে? সুমিতা বলে—আমরা তিন জন, আমি রাণু আর ভান্নু। কুঁয়োতলার কাদার উপর ইট পাতলো কে? জল বের হবার নালা কাটলো কে? সুমিতা বলে—আমি। তিনটে পুরনো ছেঁড়া ফ্রকের কাপড় কেটে নতুন করে রাণুর জন্য যে ফ্রকটা

তৈরী করেছে সুমিতা, সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে থাকেন অলকার মা।—এ ডিজাইন তোমাকে কে শিখিয়েছিল সুমিতা? সুমিতা জবাব দেয়—কেউ শেখায়নি, আমি ভেবে ভেবে মন থেকে বের করেছি। আঙিনার দূরের কোণে একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথবাবু জিজ্ঞাসা করেন—ওটা কিসের গাদা? সুমিতা জবাব দেয়—ভুট্টার শুকনো গাঁটি। কী হবে ভুট্টার গাঁটি দিয়ে? সুমিতা বলে—জ্বালানি হবে। কাঠের চেয়ে কিংবা কয়লার চেয়ে সস্তা। চার আনা দিয়ে রঘুর মা-র কাছ থেকে কিনেছি।

প্রিয়নাথবাবু—বই-টই পড়? না, ছেড়েই দিয়েছ?

—পড়ি।

—কী বই?

সুমিতার হয়ে জবাব দেয় রাণু—রঘুবংশ, হ্যামলেট আর···

হেসে ফেলেন প্রিয়নাথবাবু— তুমি কী পড়?

রাণু—আমি পড়ি চরিতকুসুম আর সরল পাটিগণিত আর···

ভানু—আমি কথামালা আর ইজি ইংলিশ পার্ট ওয়ান।

প্রিয়নাথবাবু আরও খুশি হয়ে হাসেন—কে তোমাকে পড়ায়? বড়দি সুমিতা নিশ্চয়?

রাণু—হ্যাঁ।

এইভাবে মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে যাঁরা হেমন্তবাবুর সংসারের ভিতরটাকে একটু দেখে-শুনে চলে যান, তাঁরা সুমিতার নামে অনেক প্রশংসার কথার সঙ্গে একটা দুঃখের কথাও বলেন—সুন্দর কাজ করে, খুব খাটতে পারে, কিন্তু মেয়েটার মুখে হাসি তো নেই! কেমন করে হাসবে?

হেমন্তবাবুর কথা বলতে গিয়ে এঁদের দুঃখের ভাষাটাও হঠাৎ কেমন যেন রূঢ় হয়ে ওঠে।—ভদ্রলোক শরীরটাকে রোগ ধরিয়েই সর্বনাশ করলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকের কষ্ট-টষ্ট যা হয়েছে, তা খুব কঠিন হলেও যাহোক কোনমতে সামলে নিতে পারা যায়। কিন্তু অভাব-

টাকে সামলাবেন কি করে? রোগ না হলে হেমন্তবাবু আগের মত খেটেখুটে খাওয়া-পরার ভাগ্যটাকে ধরে রাখতে পারতেন। সত্যি, খুবই দুঃখের কথা, খুব ভুল করেছেন হেমন্তবাবু।

প্রিয়নাথবাবু বলেন—ইচ্ছে করে তো রোগ ডেকে আনেনি হেমন্ত। রোগটাকে দোষ দিতে পারা যায়, কিন্তু হেমন্তকে দোষ দেবার কি কোন মানে হয়?

তবু অনেকে হেমন্তবাবুরই উপর রাগ করবার অভ্যেসটা ছাড়তে পারেন না।

ধীরাজবাবু দেখে আশ্চর্য হয়েছেন, বারান্দাতে একটা মোড়ার উপর স্থির হয়ে বসে, কেমন নির্বিকার দুই চক্ষু নিয়ে দৃশ্যটাকে দেখছেন হেমন্তবাবু, দুপুরের রোদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে রেল-কলোনির স্কুলঘরের দিকে চলে যাচ্ছে সুমিতা। সুমিতার হাতে ছাতা নেই। বীরবাঁধের রোদে শক্ত পাথরের চটানও তেতে ফেটে যায়। সেই রোদে সুমিতার মাথাটা কি পুড়ে যাচ্ছে না? দৃশ্যটা যে হেমন্তবাবুর পক্ষে একটা তপ্ত শাস্তির জ্বালা। কিন্তু সে জ্বালার একটুও আঁচ লাগে কি হেমন্ত-বাবুর চোখে?

প্রশ্নটা কী করে এত মুখর হয়ে বীরবাঁধের অনেক বাড়িতে বেশ কঠোর একটা আক্ষেপ ছড়িয়ে দিয়েছে, সে খবর জানে না সুমিতা। চারুবালার মৃত্যুর দিন সেই এগারোই মাঘ আবার এল আর চলে গেল। কিন্তু শুধু প্রিয়নাথবাবু আর মুকুটবাবুর মুহুরী জনার্দন ছাড়া আর কেউ হেমন্তবাবুর এই বাড়ির দুর্ভাগ্যের তারিখটাকে স্মরণে রাখতে পারেননি। এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেউ দেখা দিতেও এল না।

কিন্তু সেজন্য হেমন্তবাবুর মনে কিংবা সুমিতার মনেও কোন প্রশ্ন ছিল না। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আর কত আসবেন, নতুন করে আর কী-ই বা খোঁজ-খবর করবেন? অনেক মায়ার কথা আর দয়ার কথা ওঁরা বলেছেন। অনেক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

সেদিন স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফেরবার পথে হরনাথবাবুর বাড়ির সামনে এসে সুমিতাকে একবার থমকে দাঁড়াতে হলো। বাড়ির ফটকের কাছের পথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনজন। হরনাথবাবু, তাঁর স্ত্রী বিধুময়ী, আর মেয়ে অঞ্জনা।

বিধু মাসিমা আক্ষেপ করে বলেন—কী কাণ্ডই না হলো! মেয়ের মুখের সেই হাসি কোথায় গেল ?

অঞ্জলি হেসে হেসে বলে—সুমিতাদিকে এই এক বছরের মধ্যে আমি একটিবারও হাসতে দেখলাম না।

হরনাথবাবু—হাসবে কেন ? হাসতে পারবেই বা কেন ? খুব—খুব অন্যায় করেছেন হেমন্তবাবু।

চমকে ওঠেন সুমিতা। হরনাথবাবু বলেন—ভদ্রলোক হঠাৎ এ-রকম একটা রোগ বাধিয়ে বসলেন কেন ? এইটুকু একটা মেয়ের খাটুনির রোজগারে সারা জীবনটার খোরপোষ চাপিয়ে দেবেন, অদ্ভুত এই আশাটাই হলো তাঁর আসল রোগ। রক্তশূন্যতা সেরে যায়, কিন্তু এরকম মনোবৃত্তির রোগ সারে না।

বিধু মাসিমা—সত্যি, হেমন্তবাবু সুমিতাকে যেন তাঁর বড়ছেলেটি বলে মনে করে বসেছেন। ছেলের রোজগারে নিশ্চিন্ত হয়ে বাপ ঘরে বসে আর আলসেমি করে দিন কাটায়, সেটা তবু একরকমের মন্দের ভাল। কিন্তু মেয়ের রোজগারে·· না, একটুও ভাল না।

দেখেও বোধহয় বুঝতে পারলেন না হরনাথবাবু, সুমিতার চোখে-মুখে দুঃসহ একটা যন্ত্রণার জ্বালা থরথর করে কাঁপছে। বিধু মাসিমা একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আরও ভয়ানক একটা আক্ষেপ মিশিয়ে দিয়ে কথা বলেন—খুব ভুল করেছেন হেমন্তবাবু।

হরনাথবাবু—যেদিন ভুল বুঝতে পারবেন, সেদিন কিন্তু শোধরাবার আর কোন উপায় খুঁজে পাবেন না।

আর শুনতে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে না সুমিতা। চলে যাবার জন্যে ছটফট করে। বিধু মাসিমা আরও অদ্ভুত উৎসাহিত
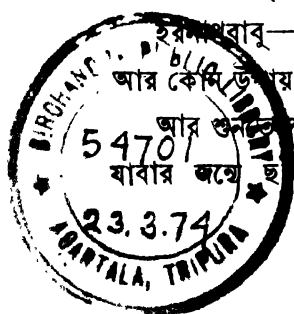
স্বরে বলতেই থাকেন—সুমিতার মত মেয়ের পক্ষে এরকম জীবন তো সহ্য করবার মত একটা জীবনই নয়। সহ্য করতে পারবেই বা কেন?

অঞ্জলি হাসে—যে বাড়িতে হাসি নেই, সে বাড়ি মরুভূমি। মা তুমি পড়েছ বইটা? চঞ্চল সরকারের সেই উপন্যাসটা, কী নাম, উতলা···

বিধু মাসিমা—না রে না, আমি ওসব উতলা দোতলা কিছুই পড়িনি।

অঞ্জলি—প্রথম লাইনটাই বলছে: যে বাড়িতে হাসি নেই, সে বাড়ি মরুভূমি।

হরনাথবাবু—ঠিক, খুব ঠিক কথা বলেছে। আমার মনে হয়, সেক্সপীয়ারও এই ধরনের কথা বলেছেন।

বিধু মাসিমা—হ্যাঁ, কথাটা হলো, মানুষ হাসলে বাঁচে, বাঁচলে হাসে। সুমিতার জন্য বড়ই দুঃখ হয়।

হরনাথবাবু—না, সুমিতার জন্যে তোমাকে দুঃখ বোধ করতে হবে না। সুমিতার বুদ্ধি আছে, কাণ্ডজ্ঞানও আছে।

বাড়িতে ফিরে এসেই খাটের উপর লুটিয়ে পড়েছিল সুমিতা। বুকের পাঁজরগুলো ভয় পেয়ে যেন টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছে। ধারণা ছিল না, জানা ছিল না, পৃথিবীতে এরকমের কথা আর ভাষা আছে। বীরবাঁধের গাছপালাও বোধহয় বীরবাঁধের হেমন্তবাবুর নামে এরকম অদ্ভুত ভৎসনার কথা কোনদিন শোনেনি রোগে আর শোকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যে-মানুষের জীবনের সুখ আর শান্তি, সে মানুষটাই অপরাধী?

কী বুঝলেন আর কী বুঝিয়ে দিতে চাইলেন মেসোমশাই ও মাসিমা? না হেসে হেসে আর শুকিয়ে-পাকিয়ে শেষ হয়ে যাবে এবাড়ির প্রাণগুলি? কিংবা বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের ইশারা পেয়ে সুমিতা একদিন এখান থেকে সরে যাবে, আর হাসবার জীবন পেয়ে যাবে?

এসময়ে কাঁদতে ভাল লাগবে, কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছা করে না। খাটের উপর উঠে বসে সুমিতা। দু'হাত দিয়ে ভাঙা খোঁপাটাকে শক্ত করে বাঁধতে গিয়ে সুমিতা যেন প্রাণটাকেও শক্ত করে দিয়ে ঘরের চারদিক তাকিয়ে নেয়। সত্যিই তো, মনে পড়েছে, বুঝতে পেরেছে সুমিতা, মা মরে যাবার দিন সেই এগারোই মাঘ থেকে আজকের এগারোই মাঘ, এই এক বছরের মধ্যে এবাড়ির কারও মুখে কোনদিনও হাসি দেখা দেয়নি। বিধু মাসিমা মিথ্যে কিছু বলেননি, বাড়িয়েও বলেননি। কিন্তু অভিযোগের কথাটা বলতে গিয়ে এত হাসলেন কেন মাসিমা, মেসো আর অঞ্জলি ?

হেমন্তবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে সুমিতা, মা-র মৃত্যুর তারিখ এই এগারোই মাঘ দিনটা বাবার চোখ দুটোকে নিংড়ে নিংড়ে শুকনো করে দিয়েছে।—কখন এলি ? আস্তে শুকনো স্বরে কথা বলেন হেমন্তবাবু। রাণু আর ভানু কাছে এসে দাঁড়ায়। বুঝতে অসুবিধে নেই, ওরাও অনেক কেঁদেছে।

সে রাতে. এগারোই মাঘের সেই রাতের কুয়াশা যখন একটা হঠাৎ হাওয়ার ঝড়ে এলোমেলো হয়ে গেল, তখন হেমন্তবাবুর দুর্ভাগ্যের ঘরের নিবিড় ঘুম আরও নিবিড় হয়ে গেল।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই হেমন্তবাবু বলে উঠলেন— শুনছিস সুমি ?

সুমিতা বলে—বল !

—বললে বিশ্বাস করবি?

—হ্যাঁ।

—কাল অনেক রাতে তোর মা এসেছিল, নিশ্চয় এসেছিল !

—কী করে বুঝলে ?

—আমি ঘুমের মধ্যেই টের পেয়েছি, কে যেন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

চেঁচিয়ে ওঠে রাণু—আমিও, আমারও মাথায় কে যেন হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

ভানু বলে—আমারও কপালের ঠিক এখানে আর এখানে, খুব আস্তে আস্তে টিপে দিয়েছে।

সুমিতা—আমি জানি, কে তোমাদের মাথাতে হাত বুলিয়েছে!

হেমন্তবাবু—অ্যাঁ? কী বললি?

চেঁচিয়ে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে সুমিতা।—আমি আমি! উঃ, কী অদ্ভুত তোমাদের ঘুমের ঘোর!

হেসে ফেলেন হেমন্তবাবু। হেসে ফেলে রাণু আর ভানু।

সেই সকালে, রোদ ওঠবার পর, সব কুয়াশা কেটে যাবার পর, খুব ব্যস্তভাবে হেঁটে হরনাথ ও বিধুময়ী দু'জনেই হেমন্তবাবুর এই বাড়ির বারান্দাতে ওঠেন আর আশ্চর্য হয়ে যান। এত হাসি? কিসের হাসি?

—ও সুমিতা! ডাক দিলেন বিধু মাসিমা।

সুমিতা আর রাণু আর ভানু, এক বছরের বিষাদের তিনটি মূর্তি হেসে হেসে বাইরে আসতেই চেঁচিয়ে ওঠেন হরনাথবাবু—এত হাসি কেন? কিসের হাসি?

সুমিতা—ভিতরে আসুন মেসোমশাই।

ঘরের ভিতরে এসে আর হেমন্তবাবুর কাছে দাঁড়িয়ে আরও আশ্চর্য হন হরনাথবাবু আর বিধুময়ী। হেমন্তবাবুও হাসছেন।

হরনাথবাবু—মনে হচ্ছে, কোন সুসংবাদ এসেছে:

হেমন্তবাবু—না হরনাথ, সুসংবাদ কি এ-জীবনে কোনদিন আর পাব?

হরনাথবাবু—তবে?

—কিছু না, দুঃখের মধ্যেই একটু হাসাহাসি। সুমিতা একটা মজা করে সবাইকে হাসিয়েছে।

হরনাথবাবু—তাই বলুন! নিতান্ত ফাঁকা হাসি, ফাঁকির হাসি। ···আচ্ছা, চলি এখন। আর একদিন না হয় আসা যাবে। বিশেষ একটা দরকারী কথা বলবার ছিল।

—বল !

বিধুময়ী—নাঃ, এরকম আর এসব ফাঁকা হাসাহাসির মধ্যে কথাটা না তোলাই ভাল।

সুমিতার মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর বেশ গম্ভীর অখুশির দৃষ্টি দিয়ে ঘরের চেহারাটাকে দেখে নিয়ে, আস্তে আস্তে পা চালিয়ে যেন একটা অস্বস্তিকে ঠেলে ঠেলে চলে গেলেন হরনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী বিধুময়ী।

দুই

আজ সাতদিন হলো ভাসানির স্রোতের কিনারা ধরে সকালে ও বিকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে নতুন একটি আগন্তুক, বীরবাঁধের প্রায় সবারই কাছে অচেনা ও অজানা এক যুবক ভদ্রলোক, সে এই ভবনাথবাবুর বাড়ির সবারই চেনা ও জানা একটি আত্মীয় মানুষ। অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অলকার মা—কে এই ছেলেটি? অঞ্জলি জবাব দিয়েছে—কলকাতার কটুমামা।

—কী নাম?

অঞ্জলি বলে—ওই তো ওই নাম।

হেসে ফেলেছেন অলকার মা—ও নামটা ছাড়াও একটা ভাল নাম আছে।

অঞ্জলি—কান্তিচন্দ্র না কান্তচন্দ্র, ঠিক মনে পড়ছে না, এইরকম একটা ভাল নাম আছে।

—তোমার আপন মামা?

অঞ্জলি—আপন মামার চেয়েও বেশি আপন মামা। মা বলেন, সত্যিকারের আপনজনও এত আপন হয় না।

—তোমার কলকাতার কটুমামা নিশ্চয় কলকাতার মানুষ!

অঞ্জলি—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো বলি, কলকাতার কটুমামা।

—দেশ কোথায়?

অঞ্জলি—নিউ আলিপুর।

—নিউ আলিপুর তো কারও দেশ হতে পারে না, অঞ্জলি। তোমাদের দেশ যেমন শান্তিপুর, তেমনই তোমার কটুমামারও একটা দেশ আছে।

অঞ্জলি—না, নেই কাকিমা। কটুমামার ওরকম কোন দেশ নেই।

—তোমার কটুমামার বাড়িতে কে কে আছেন?

অঞ্জলি—শুধু একজন বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। কটুমামার দিদিমা হন, থুত্থুড়ে এক বুড়ি। দিনরাত সকাল-সন্ধ্যা শুধু জপ আর জপ। হাতে একটা মালা সব সময় কাঁপছে। হাতটা কিন্তু কাঁপে না. মাথাটা কাঁপে। অদ্ভুত!

—কী কাজ করেন তোমার কটুমামা?

অঞ্জলি—ফটো তোলেন।

—ফটো তোলার চাকরি করেন?

অঞ্জলি—ছিঃ, কী যে বলেন কাকিমা! কটুমামার চাকরি করবার দরকার নেই। মা বলেন, কটুমামা চাকরি করতে ঘেন্না বোধ করেন।

—তাহলে বল, তোমার কটুমামার বাবা অনেক টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছেন?

অঞ্জলি—অনেক অনেক! বাবা বলছিলেন, কটুমামার বাবা ওষুধের কারবার করে অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন। নিউ আলিপুরের মস্তবড় ওই বাড়ি ছাড়া আরও একটা বাড়ি কিনেছিলেন। সে বাড়িটা হলো আমাদের বীরবাঁধের স্যামুয়েল সাহেবের বাড়ির মত একটা বাড়ি। চমৎকার ছবির মত বাড়ি।

—কলকাতা গেলে তোমাদের বোধহয় কটুমামার নিউ আলিপুরের বাড়িতেই থাকতে হয়?

অঞ্জলি—কী যে বলেন কাকিমা? কটুমামার নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্যেই তো আমরা কলকাতাতে গিয়েছিলাম। রোজই সাহেবদের হোটেল থেকে মাংস আনতেন কটুমামা। বাবা কটুমামাকে বেশ ধমক দিয়ে কড়া কথা শুনিয়ে দেন—কলকাতাতে আসবার কোন গরজ কিংবা কোন দরকার আমার

নেই। শুধু এই কটুচন্দ্রটার মায়ার টানে পড়ে, বাধ্য হয়ে, এত ঝঞ্ঝাট হয়রানি সহ্য করে কলকাতাতে আসতে হয়।

—শুনে কটুমামা বোধহয় খুব হাসেন?

অঞ্জলি—হ্যাঁ। কটুমামাও বাবাকে অনেক ঠাট্টার কথা শুনিয়ে দেন।

—ঠাট্টার কথা?

অঞ্জলি—হ্যাঁ। বাবা আর কটুমামার সম্পর্কটা তো একটা ঠাট্টা। নয় কি, কাকিমা?

—তা বটে। ভগ্নীপতি আর শালাবাবু।

অঞ্জলি—তবে! কটুমামা বাবাকে এক-এক সময় হরদা বলে ডাকতেই পারেন না। হর-ঠাকুর বলে ডাকেন আর হাসেন।

—তোমার কটুমামার এখনও বিয়ে হয়নি নিশ্চয়? হলে, নিউ আলিপুরের বাড়িতে একটি মামীকে দেখতে পেতে। কিন্তু দেখনি নিশ্চয়? এক বুড়ি ছাড়া সে-বাড়িতে কেউ নেই, তাই না?

অঞ্জলি—কটুমামার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের মাত্র ছ'মাস পরে বউ মরে গেল।

—ভাগ্যিমানের বউ মরে।

অঞ্জলি খিল খিল করে হাসে—সে-কথা সত্যি, আবার মিথ্যেও। ধরুন, আপনি কাকিমা যদি আজ মরে যান, তবে কাকাকে কেউ কি ভাগ্যিমান বলবে? কখ্খনো না। কিন্তু কটুমামা ভাগ্যিমান বলেই সেই বউ মরেছে।

—কে বললে একথা?

অঞ্জলি—মা বলেছেন, বাবা বলেছেন। সব কথা জানা থাকলে আপনিও বলতেন। ওঃ, কটুমামার সেই গেঁয়ো বউ কী ভয়ানক হাড়-জ্বালানে মেয়ে ছিল! যেমন চেহারা, তেমনই স্বভাব, দুই-ই বিশ্রী।

—কিন্তু তোমার কটুমামা আবার বিয়ে করলেই তো পারতেন!

অঞ্জলি—কে জানে কেন আর বিয়ে করলেন না! মা আর বাবা অনেক সাধাসাধি করেছেন, তবু বিয়ে করতে কটুমামাকে রাজী করাতে পারেননি। কিন্তু···

অঞ্জলিকে হঠাৎ চুপ হয়ে যেতে দেখে অলকার মা-র চোখের দৃষ্টি চিকচিকিয়ে ওঠে। কিন্তু কী?

অঞ্জলি—আমি ঠিক বলতে পারব না, কাকিমা। আমি সব কথা শুনতে পাইনি। যা শুনেছি, তা'ও ঠিক বুঝতে পারিনি।

—কার কথা? কিসের কথা? কাদের কথা?

অঞ্জলি—বাবা বলছিলেন: আমি এবার এক ঢিলে দুই পাখি মারব।

—তোমার মা কিছু বলেননি?

অঞ্জলি—মা বললেন: দেখ চেষ্টা করে!

—আমার মনে হয়, দুই পাখীর মধ্যে একটি পাখী হলো তোমার কটুমামা। তোমার কী মনে হয়?

অঞ্জলি—এঃ, আপনি একেবারে স্পষ্ট করে আমার সন্দেহের কথাটা বলে দিলেন, কাকিমা!

—কিন্তু আর একটি পাখী কে?

অঞ্জলি—এ সন্দেহটাকে এখুনি আউট করে দেওয়া উচিত হবে না, কাকিমা। আমি বলতে পারব না, কাকিমা।

—আমার তো মনে হয়, সুমিতা হলো এই পাখী।

অঞ্জলি চমকে ওঠে। সর্বনাশ, আপনি ভয়ানক ঠিক সন্দেহ করতে পারেন, কাকিমা!

যা জানতে চেয়েছিলেন, যা বুঝতে চেয়েছিলেন অলকার মা, তার সবই জানতে আর বুঝতে পেরে, আর, আশ্চর্য না হয়ে, বরং চোখ-মুখের চেহারাটাকে যেন একটু হাসিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অলকার মা। চলে গেল অঞ্জলি। অলকার মা শুধু একবার হরনাথবাবুর বাড়িটার দিকে তাকালেন।

সাতদিন ধরে ভাসানির স্রোতের কিনারা ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর ক্যামেরা দিয়ে তাক্ করে করে অনেক দৃশ্যের ছবি ধরেছে যে আগন্তুক মানুষটা, অঞ্জলির যে কটুমামা, কলকাতার নিউ আলিপুরের কান্তিনাথ, সে আরও সাতটি দিন ঘুরে-ফিরে এই বীরবাঁধের শাল-জঙ্গলের, ছোট পাহাড়ের আর পাখির ছবি তুলেছে। কিন্তু বীরবাঁধে এসে প্রথম দিনেই যে ছবি তোলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কান্তি, সে ছবি আজও তুলতে পারেনি।

বিকেলবেলা স্কুলের ছুটির পর স্কুলের বড়দিদি ওই সুমিতা সেদিন যখন লাল কাঁকরের পথ ধরে হেঁটে হেঁটে হরনাথবাবুর বাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছেছিল, সুমিতার সেই একলা ও আনমনা চেহারাটার উপর যখন ঠাণ্ডা রোদের আভা ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুমিতা। বাধা পেয়েছিল সুমিতা। ফটকের লতানে গোলাপের একটা ডাল একগাদা ফোটা ফুলের বোঝার ভারে নুয়ে গিয়ে একেবারে মাটির উপর গড়িয়ে পড়েছিল। লতাটাকে এক হাতে তুলে নিয়ে ফটকের থামের গায়ের কাছে সরিয়ে দেয় সুমিতা।

বাড়ির বারান্দাতে কান্তিনাথের হাতের ক্যামেরা চমকে ওঠে, আর দুলতে থাকে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় কান্তিনাথ—দিদি, ও দিদি, শিগগীর একবার বাইরে আসুন।

বিধুময়ী ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন।—কী হলো ভাই? কী ব্যাপার?

কান্তিনাথ—চলে যাচ্ছে এই যে মেয়ে, তাকে একবার ডাক।

—কেন ভাই?

কান্তিনাথ—ওর একটা ফটো তুলবো।

বিধুময়ী বলেন—বেশ তো! কিন্তু এখুনি ডাকাডাকি না করে বরং···

কান্তিনাথ—বরং আবার কিসের? এখুনি ডাকতে অসুবিধের কি আছে?

—আছে ভাই, আছে। ও মেয়ে বড় গম্ভীর মেয়ে।

কান্তি—তুমি একটা ডাক দিয়ে আসতে বললে ভয় পেয়ে যাবেন, উনি কি এতই ভীরু ?

—আমার ডাক শুনে ভয় পাবে না ঠিকই, কিন্তু তোমার ক্যামেরা দেখলে ভয় পাবে বোধহয়।

কান্তি—আমি কিন্তু ও মেয়ের ফটো তুলবই। তুমি যেমন করে পার একটা ব্যবস্থা কর। দেরি করবে না, দিদি। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, তার বেশি দেরি নয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা ! আমি ওরকম একটা গম্ভীর মুখের ফটো তুলব না। হাসতে হবে, হাসিমুখ চাই।

কলকাতার নিউ আলিপুরের কান্তিনাথের এই শখের দাবী, এই খেয়ালের অনুরোধ তুচ্ছ করতে পারেন না বিধুময়ী, তুচ্ছ করতে পারবেন না হরনাথবাবুও। তুচ্ছ করতে চেষ্টা করলে সেটা এঁদের অনেক যত্ন দিয়ে তৈরী করা একটা সৌভাগ্যকে তুচ্ছ করা হবে।

আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। পাঁচ বছর আগেও যে ছিল একেবারে অজানা অচেনা একটা অপরিচিত অস্তিত্বের মানুষ, সেই কান্তিনাথ আজ এঁদের কাছে তথাকথিত আপনজনের চেয়ে বেশি আপনজন। বিধুময়ীর হঠাৎ দু'চার টাকার দরকার হলে তাঁর সেই দরকারের কথাটাকে যখন শুধু একটু আভাসে বলেন, স্পষ্ট করে মুখ খুলে বলেন না, তখনই পকেট থেকে নোট বের করে বিধুময়ীর হাতে তুলে দেয় কান্তিনাথ। ভাবে না, কোন হিসেবও করে না। একবার পাঁচ টাকা দরকার বলে ষাট টাকা দিয়েছিল কান্তি।

হরনাথবাবুর বাড়ির ঘরে ঘরে এত যে সুন্দর আসবাব, সে-সব কলকাতা থেকে কান্তিনাথই কিনে পাঠিয়েছিল। রেলওয়ের সামান্য মাইনের ক্লার্ক ছিলেন, তিন বছর হলো রিটায়ার করে রেল-কলোনির কাছে যিনি ছোট একটা বাড়ি তৈরি করিয়েছেন, তাঁর ঘরে এরকম চমৎকার আসবাব-সম্পদ কেমন করে যে জমা হলো, সেটা বীরবাঁধের সকলের কাছে একটা বিস্ময়েরই প্রশ্ন। ছোট বাড়িটা এই তিন

বছরের মধ্যে বেশ বড় দোতলা বাড়িতে পরিণত হয়েছে, এটাই বা কি কম বিস্ময়? বিধুময়ী অবশ্য বলেন যে, তাঁদের শান্তিপুরের জমিদারীর আয়টা মন্দ নয়। কিন্তু ঐকথার কি মানে হয়? অলকার মা এবাড়ি আর ওবাড়ির গৃহিণীদের কাছে একটা কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন—জমিদারী প্রথা তো কবেই উঠে গিয়েছে। তবু এত আয় হয় কেমন করে, ভগবান জানেন।

প্রিয়নাথবাবু যখন পার্বতীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেন, তখন ঠিক এরকমের কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন না। প্রিয়নাথবাবু বলেন—বোধহয় ভাল কমপেনসেশনের টাকা পেয়েছে হরনাথ।

পার্বতীবাবু—হতে পারে।

ক'মাস আগে সপরিবারে কলকাতাতে গিয়ে দশ-বিশটা দিন কাটিয়ে দিয়ে আবার বীরবাঁধের জংলী হাওয়ার মধ্যে ফিরে এসেছেন হরনাথবাবু, এটাও তো বেশ বড়রকমের টাকা খরচের ব্যাপার। কমপেনসেশনের টাকাগুলো এভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন হরনাথবাবু? প্রিয়নাথবাবু তাঁর সন্দেহহীন মাথাটাকে দুলিয়ে সমালোচনা করেন—খুব অন্যায় করছে হরনাথ। মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি আছে। দায়িত্বের সে কাজটার জন্যে কি টাকা খরচ করতে হবে না? সব টাকা ফুরিয়ে দিলে মেয়ের বিয়ে দেবে কেমন করে?

পার্বতীবাবুর মাথাটা অবশ্য এতটা সন্দেহহীন মাথা নয়। পার্বতীবাবু বলেন—বুঝতে পারি না, হরনাথবাবু কেন যে এত জোর গলায় কথাটা বলেন!

প্রিয়নাথবাবু—কী কথা?

পার্বতীবাবু—হরনাথবাবু বলেন: এখন আমি মেয়ের বিয়ের জন্য বিশ হাজার টাকা খরচ করতেও ভয় পাব না।

হরনাথবাবুর অনেক যত্ন দিয়ে গড়া সৌভাগ্যটার কোন খবর রাখেন না এঁরা, তাই এঁরা এ ধরনের বিস্ময় বোধ করেন।

একটা সামান্য আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু সেই ঘটনাকে অনেক

চেষ্টা ও যত্ন দিয়ে একটা সৌভাগ্যে পরিণত করে নিতে পেরেছেন হরনাথবাবু। এ-বছর পুজোর সময় বিন্ধ্যাচল থেকে ফেরবার পথে গয়াতে দুটো দিন কাটিয়েছিলেন সপরিবারে হরনাথবাবু। গয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যখন ট্রেনের অপেক্ষায় বসে ছিলেন, তখন একটি অচেনা অজানা যুবক হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনারা কি কলকাতা যাবেন ?

—না।

—তবে।

—আমরা মধুপুরে নামব।

—বেশ তো, মধুপুরে যেতে হলে আপনাদের এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা ট্রেনের অপেক্ষা করতে হবে!

—হাঁ, সন্ধ্যা, সাড়ে সাতটায় আমাদের ট্রেন।

—তার মানে, এখনও আরও চারঘণ্টা আপনাদের ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে!

—হ্যাঁ।

—তাহলে দয়া করে আমার এই ব্যাগটা আপনাদের জেপাজতে রইল। আমি দু'ঘণ্টার মধ্যেই একটা কাজ সেরে ফিরে আসব আমার ট্রেন হলো রাত দশটায়।

হরনাথবাবু প্রশ্ন করে কোন কথা বলবার আগেই অচেনা যুবকটি হরনাথবাবুর বাক্স-পেঁটরার ভিড়ের মধ্যে ব্যাগটাকে মিশিয়ে দেয়, আর চলে যায়।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই আবার ফিরে আসে অচেনা যুবক। গলার স্বর মৃদু করে নিয়ে কথা বলে আর হেসে ফেলে অচেনা যুবক। —হাজারিবাগে আমাদের একটা কোলিয়ারী ছিল, সেটা মাত্র দেড় লাখ টাকায় বিক্রী করে দিলাম। তারই সঙ্গে একবার দেখা করে আসছি।

চমকে উঠলেন, আবার হেসেও উঠলেন হরনাথবাবু। কিন্তু কোন

কথা স্পষ্ট করে বলবার আগেই হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল সেই অচেনা যুবক। পাঁচবছর আগে হঠাৎ-সাক্ষাতে পরিচিত হওয়া সেই যুবকই কান্তিনাথ, যে এখন বীরবাঁধের এদিকে-সেদিকে ঘুরে-ফিরে যত বিচিত্র ও সুন্দর শোভার ছবি তুলে বেড়াচ্ছে।

এ বড় আশ্চর্য মানুষ। এ বড় অদ্ভুত রকমের প্রাণখোলা ও মন-খোলা মানুষ। গয়া স্টেশনে সন্ধ্যা হবার আগেই যখন ফিরে এল কান্তিনাথ, তখন নয়, তার আগেই বাস্কেট খুলে দুই ডিশ ভরতি করে মিষ্টি খাবার ও ফল প্রস্তুত করে রেখেছিলেন বিধুময়ী।

কান্তিনাথ এসে কাছে দাঁড়াতেই হরনাথবাবুর গলা থেকে একটা স্নেহাক্ত বিহ্বল স্বর আপনা থেকেই উথলে উঠল। হরনাথবাবু বলেন —খাও ভাই।

কান্তিনাথ—এ কী কাণ্ড করেছেন আপনারা?

বিধুময়ী—তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, তোমার বেশ খিদে পেয়েছে।

কান্তিনাথ—ঠিকই বুঝেছেন। সেই কোন্ সকালে এক স্লাইস রুটি আর দু' পেয়ালা চা খেয়েছিলাম।

বেডিংয়ের উপর বসে খাবারের ডিশ হাতে তুলে নেয় কান্তিনাথ।

হরনাথবাবু—তোমার নামটা কিন্তু এখনও শুনতে পেলাম না!

—আমি হলাম কান্তিনাথ মজুমদার।

ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে কান্তিনাথ।—সবই ক্যাশ, দেড় লাখ টাকার সবটা অবশ্য নয়, মাত্র তেত্রিশ হাজার। ব্যাটা মাড়োয়ারী চেক দিলে না, একগাদা নোট দিলে, অগত্যা…।

বিধুময়ীর দুই চোখে স্নেহাক্ত হাসি চিকচিক করে।—বেশ নাম, সুন্দর নাম!

কান্তিনাথ—আমার ডাক নামটাই কিন্তু বেশি বিখ্যাত। পাড়ার মানুষ বলে, কেটু মজুমদার।

হেসে ফেলে অঞ্জলি। কান্তিনাথ চোখ বড় করে তাকায় আর হাসে।—খুকী, তুমি হাসলে কেন, বল তো? আমার নাম শুনে?

অঞ্জলি কোন কথা বলে না। হাত দিয়ে মুখ চেপে নিয়ে আরও হাসে।

বিধুময়ী বলেন—এ মেয়ে কিন্তু এমন কিছু খুকীটি নয়। বয়স হয়েছে। পনেরোতে পড়েছে···তোমার বয়স কত হল ভাই?

—আমি এখন প্রায় বত্রিশ।

বিধুময়ী—আমারও তাই মনে হয়েছিল।

একটা পাখা হাতে নিয়ে কান্তিনাথের কাছে এগিয়ে আসেন বিধুময়ী। কান্তিনাথ চেঁচিয়ে আপত্তি করে—আহা, ওসব কাণ্ড করবেন না দিদি।

বিধুময়ী—আমার নিজের ভাইটি আজ এখানে থাকলে আমি যে কাণ্ড করতাম, তাই করছি। তার বেশি কিছু করছি না।

ডাক দিলেন বিধুময়ী—কটুমামাকে প্রণাম কর, অঞ্জলি। এটা আবার বলতে আর শিখিয়ে দিতে হবে নাকি?

হরনাথবাবু আর বিধুময়ীর অনুরোধের আর আবেদনের মায়াতে পড়ে কান্তিনাথকে শেষপর্যন্ত একই ট্রেনে উঠে আর মধুপুর হয়ে কলকাতাতে ফিরতে হয়েছিল।

পরের দিন সকালবেলা মধুপুরে নামবার সময় হরনাথবাবু একেবারে নীরব হয়ে আর বিহ্বল হয়ে কান্তিনাথের গলাটা জড়িয়ে ধরলেন। আর বিধুময়ী আঁচল তুলে দুই চোখ বার বার মুছলেন।

কান্তিনাথ বলে—আপনারা এরকম কাতর হয়ে পড়ছেন কেন বলুন তো? আমি কি দু'চারদিনের মধ্যেই মরে যাচ্ছি যে, আমার সঙ্গে আর কোনদিন আপনাদের দেখা হবে না?

বিধুময়ী—কবে দেখা হবে, বল?

কান্তিনাথ—আপনাদের যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিনই দেখা হবে।

হরনাথ—কি বললে ?

কান্তিনাথ—যেদিন ইচ্ছে হবে কলকাতাতে চলে আসবেন। যতদিন ভাল লাগবে, আমার বাড়িতে থাকবেন।

এইবার কটুমামাকে প্রণাম করতে গিয়ে আর হাসতে পারে নি অঞ্জলি। কিন্তু হেসে হেসে ধমক দিয়েছিল কান্তিনাথ—খবরদার, মুখ গম্ভীর করতে পারবে না অঞ্জলি। আমি গম্ভীর মুখ একটুও পছন্দ করি না।

অঞ্জলি হেসে ফেলে। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠতেই কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান্তিনাথ হাসে।—কী ভাল লাগবে তোমার, অঞ্জলি ? রেকর্ড-প্লেয়ার, না ট্রানজিস্টর ? কলকাতাতে পৌঁছেই আমি কিনব আর পাঠিয়ে দেব। শিগ্‌গীর বল !

অঞ্জলি বলে—রেকর্ড-প্লেয়ার।

ট্রেনে একটি রাত্রির কয়েকটি ঘণ্টা, কিন্তু তারই মধ্যে যেন অদ্ভুত এক মমতার আবেশে হরনাথবাবু আর বিধুময়ী এই অচেনা অজানা কান্তিনাথকে আপন ভাইটির মত আপন করে নিতে পেরেছিলেন। এক বছরের মধ্যে সেই কান্তিনাথ আপন ভাইটির চেয়েও বেশি আপন হয়ে গিয়েছে।

চিঠিতেও কতবার মিষ্টি ভাষায় মায়ালু করে নিয়ে কান্তিনাথকে কত ভর্ৎসনা করেছেন—এক মাসের মধ্যেও একটা চিঠি দিলে না, দিদিটা যে এদিকে ভেবে ভেবে কাঁদছে, সেটা কি একবারও চিন্তা বুঝতে চেষ্টা করেছো ?···হ্যাঁ, কলকাতাতে কাশ্মীরী শালে আসে বলে শুনেছি। তুমি কি কষ্ট করে একবার একটু খোঁজর গল্প দেখবে, তোমার জামাইবাবুর গায়ে দেবার মত একটা ভাল • বীর-দাম কত পড়বে ?

বিধুময়ীর চিঠির জবাবটা অবশ্য তাড়াতাড়ি আসে নি। কিন্তু ডাকের পার্শেল হয়ে একটা কাশ্মীরী শাল সাতদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে এসে গিয়েছিল।

রেল-কলোনির অনেকে, তা ছাড়া কলোনির বাইরে বীরবাঁধের বীরপাড়ার সেনবাবু আর ডাক্তার নরেশ দত্ত আরও ভাল করে জানেন, নিতান্ত একটি পর মানুষকে আপন জনের চেয়েও আপন করে নেবার কী অদ্ভুত আর্ট জানেন হরনাথবাবু ও বিধুময়ী, দুজনেই। ওঁদের চোখের দৃষ্টিতে মানুষ চিনে ফেলবার অদ্ভুত একটা ক্ষমতাও আছে। বছর পাঁচেক আগে, সেনবাবুর শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে কুটুম্ব হন যে বটুকবাবু, যিনি তিন মাইল সড়ক তৈরীর একটা কণ্ট্রাক্ট পেয়ে এই বীরবাঁধে পুরো একটা বছর ছিলেন, তাঁকে এক মাসের চেষ্টাতে আপন করে নিতে পেরেছিলেন হরনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী। এমনই আপন করে নিতে পেরেছিলেন যে, সেনবাবুর বাড়িতে একবার আসতে হলে বটুকবাবুকে হরনাথবাবু কিংবা বিধুময়ীর অনুমতি নিতে হতো। সেন-বাবুদের বাড়ির রান্নাতে ঝালের খুব বাড়াবাড়ি, সে রান্নার কোন মাছ-মাংস বটুককাকার মুখে ঠেকানোও উচিত নয়। আতঙ্কিত হয়ে আপত্তি করতেন বিধুময়ী—ও-বাড়ির রান্নার সুক্তো অম্বল খেলেও আপনি বিপদে পড়বেন কাকা। আপনার স্বাস্থ্যের সর্বনাশ হবে।

সেনবাবুর বাড়ির পাশে একটি বাড়ি ভাড়া করে অফিস করেছিলেন কণ্ট্রাক্টর বটুকবাবু, সেখানেই একটি ঘরে তিনি থাকতেন। প্রথম দুটো মাস বেয়াই সেনবাবুর বাড়ি থেকে দু'বেলার ভাত-ডাল মাছের ঝোল বারে তা। তারপর তাঁর গিরিডির বাড়ির পুরনো চাকর শম্ভু যখন ধরলেন। 'ন তাঁর এই অফিস-বাড়ির আর-একটি ঘরে রান্নার ব্যবস্থা কারি। সেনবাবুর বাড়ির রান্না কিংবা শম্ভুর হাতের রান্না, কারও বলুন কি বটুকবাবুর মনে সামান্য অভিযোগও ছিল না। সেনবাবুর বাড়ির রান্নাতে লঙ্কার ঝাল, আর শম্ভুর হাতের রান্নাতে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ, এর কোনটিই বটুকবাবুর অপছন্দ নয়, দুই-ই তাঁর কাছে সমান স্বাদুতার বস্তু। কিন্তু বিধুময়ীর মমতার শাসনে দুই-ই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কে জানে কবে, কেমন করে, কণ্ট্রাক্টর

বটুকবাবু এই হরনাথবাবু ও বিধুময়ীর আপনজন হয়ে গেলেন। বটুকবাবুর জন্য দুবেলার খাবার হরনাথবাবুর বাড়ি থেকে নিয়ে আসত শম্ভু। ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি-কাশিতে একটু বেশি কাবু হয়ে পড়তেন বটুকবাবু। এরকম অসুস্থ অবস্থাতে অফিস-বাড়িতে পড়ে থাকবার উপায় ছিল না। বিধুময়ী এসে, দুই চোখ ছলছল করে আর একরকম জোর করে বটুকবাবুকে দু'চারদিনের জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন—আমরা থাকতে আপনি এখানে একটা চাকরের সেবার অধীন হয়ে পড়ে থাকবেন, এরকম ব্যাপার চোখে দেখলেও আমাদের পাপ হবে। না কাকা, আপনাকে যেতেই হবে। আপনার আপত্তির কোন কথা শুনবো না।

বটুকবাবু বলেন—তুমিও দেখছি আমাদের সেই পারুলের মত একরোখা মেয়ে। আমার ছোড়দার মেয়ে পারুল। ধানবাদের আদালতে কাজ করে পারুলের স্বামী। দুদিনের কাজের জন্য একবার ধানবাদে গিয়েছিলাম, হোটেলে ছিলাম। খবর পেয়ে পারুলের সে কী রাগ! হোটেলে এসে আমার হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড শুরু করে দিল—আমি থাকতে আপনি হোটেলের ভাত খাবেন, কাকা? তার চেয়ে আমার গালে একটা চড় মারুন না কেন! অগত্যা···।

বিধুময়ী—আমি পারুল নই বলে কি আপনার কেউ নই, কাকা?

বটুককাকা—আহা, আমি কী সে-কথা কখনও বলেছি?

ডাকসাইটে কণ্ট্রাক্টর, যাঁর হিসেবী বুদ্ধির অনেক বিস্ময়ের গল্প পাবলিক ওয়ার্কসের বাবুদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়, তিনি এই বীর-বাঁধে এসে এক অচেনা মুখের কাকা ডাক শুনে বোধহয় মুগ্ধ হয়েই গিয়েছিলেন। বিধুময়ীর প্রত্যেকটি মায়াময় অনুরোধের কাছে তিনি যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন। সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে হাসতে থাকেন। —আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। লক্ষ্মীপূজোর দিনে শুধু তোমাদের

বাড়ির লুচি নাড়ু খেয়ে আসবো, অন্য কোন বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বীরবাঁধের সকলেই একদিন দেখতে পেয়েছিল, একটু আশ্চর্যও হয়েছিল, হরনাথবাবুর একতলা বাড়িটাকে দোতলা করবার কাজে লেগে গিয়েছে চারজন মিস্তিরী আর দশজন মজুর। কারও বুঝতে বাকি থাকে না, ওরা সব কণ্ট্রাক্টর বটুকবাবুর মিস্তিরী আর মজুর। সেনবাবু আরও একটু বেশি বুঝতে পারেন, ওরা বটুকবাবুর স্টোরের সিমেণ্ট নিয়ে, বটুকবাবুর ইট চুন বালি নিয়ে হরনাথবাবুর বাড়ির দোতলার তিনটে ঘর তৈরী করছে।

সেই বটুকবাবু এখন কোথায়? এখন তিনি এই পৃথিবীতে নেই। তিন বছর হলো তিনি মারা গিয়েছেন। তিন বছর আগে ওই হরনাথবাবু একদিন সেনবাবুকে পথে দেখতে পেয়ে কয়েকটা কথা বলেছিলেন।—আপনার বেয়াই হন, কী যেন সেই ভদ্রলোকের নাম? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বটুকবাবু, তাঁর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নের চিঠি পেয়েছি। কিন্তু···।

এত যত্ন করে যাঁদের এত আপন করে নিতে পারেন হরনাথবাবু ও তাঁর সহধর্মিণী, তাঁদের আবার এত সহজে ছেড়ে দিতে ও একেবারে ভুলে যেতে পারেন কেমন করে? প্রশ্নটা ডাক্তার নরেশ দত্তের কাছেও একটা বিস্ময়ের প্রশ্ন। কারণ, আর কেউ না জানুক, তিনি জানেন, দুবছর আগে তাঁরই ছোটমামাকে এঁরা সাতদিনের আলাপ-পরিচয় আর দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে একেবারে আপনজন করে নিয়েছিলেন। মধুপুরে অডিটর হেমেনবাবুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে মধুপুরে গিয়েছিলেন হরনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী বিধুময়ী। মধুপুরের শাল-সেগুনের সবচেয়ে বড় কারবারী মানুষটি, ডাক্তার নরেশ দত্তের ছোটমামা সেই বিজয় বিশ্বাস, যিনি তখন শিকারের শখে বেপরোয়া টাকা খরচ করে করে কারবারটার সব রক্ত নিংড়ে বের করে নিচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দশ মিনিটের আলাপেই একটি ভাগ্নী

হয়ে গিয়েছিলেন বিধুময়ী।—আপনি যখন নরেশদার মামা, তখন আমারও মামা।

শুনে বিজয় বিশ্বাস খুব খুশি হয়েছিলেন—তা বইকি!

বিধুময়ী—সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, আপন মনে করলেই তো মানুষ আপন হয়ে যায়। আপনি কী মনে করেন, মামা?

বিজয় বিশ্বাস—ঠিক কথা, আমিও তাই মনে করি।

যেমন বিজয় বিশ্বাসকে, তেমনই তাঁর স্ত্রী সুহাসিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন বিধুময়ী।—আমাদের ওখানে আপনি কবে পায়ের ধুলো দেবেন বলুন, মামী? আমি আপনার কাছ থেকে কথা না নিয়ে যাব না।

সুহাসিনী—যাব যাব, সুবিধে হলে একদিন নিশ্চয়ই যাব।

হরনাথবাবু—এরকম অস্পষ্ট করে বললে চলবে না মামী। তারিখটা বলুন, কবে যাবেন!

সুহাসিনী—কী করে বলি! আমার মেয়ে-জামাই আসছে। একটা মাস ওরা থাকবে। এক মাসের মধ্যে আমার পক্ষে মধুপুর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া…।

বিধুময়ী—একটা কথা জিজ্ঞেসা করি! মামার জন্মদিন কবে?

বিজয়বাবু চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—এই তো, আর দেড় মাস পরে, পঁচিশে ফাল্গুনে।

বিধুময়ী—পঁচিশে ফাল্গুনে আমাদের ওখানে বীরবাঁধের বাড়িতে আপনার জন্মদিনের সব আনন্দের ব্যবস্থা করা হবে, মামা।

বিজয় বিশ্বাস—বেশ তো, ভালই তো। পঁচিশে ফাল্গুনে তোমাদের ওখানে জন্মদিনের হৈ-হৈ সেরে আমি চলে যাব হাজারিবাগে, তোমার মামী চলে আসবেন মধুপুরে। সে-সময় হাজারিবাগে আমার পনেরো দিনের শিকারের প্রোগ্রাম ঠিক হয়েই আছে।

হরনাথবাবুর বাড়িতে বিজয়মামার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বিধুময়ী

নিজের হাতে বিজয়মামার কপালে চন্দনের তিলক এঁকে দিলেন। মামী সুহাসিনী অঞ্জলিকে কোলের উপর বসিয়ে কত গল্পই না বললেন। পাখির গল্প, চাঁদের গল্প, মন্দিরের গল্প।

এর পর মাত্র দুটি মাস পরে একটা লরি এসে যেদিন হরনাথবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়ালো, আর শাল-সেগুনের সুন্দর সুন্দর পালিশকরা চকচকে টেবিল সোফা চেয়ার মিরর আলনা আর আলমারি নামিয়ে দিল, সেদিন আর কেউ বুঝতে না পারুক, ডাক্তার নরেশ দত্ত বুঝেছিলেন, মামা বিজয় বিশ্বাসেরই প্রীতির উপহার হয়ে এইসব জিনিস হরনাথবাবুর ঘরের শোভা হবার জন্য এসে গিয়েছে।

কিন্তু সেই বিজয় বিশ্বাস এখন কোথায়? একেবারে নিঃস্ব রিক্ত ও দরিদ্র বিজয় বিশ্বাস এখন কাশীর গলিতে একটি ক্ষুদ্র ঘরে সস্ত্রীক থাকেন। কয়েক মাস আগে হঠাৎ একদিন এই বীরবাঁধে নরেশ দত্তের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজয় বিশ্বাস। মামী সুহাসিনীর খুবই কঠিন অসুখ। নরেশ যদি শ'খানেক টাকা সাহায্য দেয়, তবে ভাল হয়।—হ্যাঁ, একবার হরনাথ আর বিধুকে খবর পাঠাও, নরেশ। ওদের দেখতে ইচ্ছে করছে।

হ্যাঁ, হরনাথ আর বিধুময়ীকে খবর পাঠিয়েছিলেন নরেশ দত্ত। কিন্তু দুজনের কেউই আসেন নি। অনেকদিন পরে স্টেশনে নরেশ দত্তের সঙ্গে দেখা হতে হরনাথ বলেছিলেন—মধুপুরে আপনার এক মামা থাকতেন, কী যেন নাম!···মনে পড়েছে, বিজয় বিশ্বাস। সে ভদ্রলোক আজকাল কোথায় থাকেন? কাশীতে বোধহয়? খুব ভাল, খুব ভাল।

আজ আবার এতদিন পরে আর নতুন করে বীরবাঁধের কেউ কেউ জানতে পারলেন যে, ক্যামেরা হাতে নিয়ে আর এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে ভদ্রলোক, তিনি হলেন হরনাথবাবুর মেয়ে অঞ্জলির কটুমামা, বিধুময়ীর নতুন ভাই। অলকার মা'র মুখ থেকে খবরটা

এরই মধ্যে কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে। বুঝতে পারা গেল, এই কলকাতাতে কটুমামার বাড়িটাই হলো অঞ্জলির নতুন মামাবাড়ি। শান্তিপুরে বিধুময়ীর কয়েকটি ভাই আছেন, সে-কথা এখানেও অনেকে জানেন। কিন্তু সে-সব ভাইয়ের কাউকেই কোনদিনও বীরবাঁধে এসে একটি দিনও থাকতে কেউ দেখে নি। এই ভাইটি কিন্তু সাতদিন ধরে রয়েছেন।

এর পর কী হবে? হরনাথবাবুর দোতলা বাড়িটা কি এইবার তিনতলা হয়ে যাবে? হতে পারে, আশ্চর্যের কিছু নয়। উপকারের মানুষ আর সাহায্যের মানুষ খুঁজে বের করবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এই দুটি মানুষের। অলকার মা কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, তাঁর কাছ থেকে কথাটা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাও বুঝে উঠতে পারছেন না, কী ব্যাপার? এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন হরনাথবাবু, কিন্তু ঢিলটা কিসের?

কলকাতার নিউ আলিপুরের কান্তিনাথের ক্যামেরা পাহাড় আর জঙ্গলের ছবি তুলে তুলে বোধহয় ক্লান্ত হয়েছে। বীরবাঁধে এসে প্রথম দিনেই যার ছবি তোলবার জন্যে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল কান্তিনাথের ক্যামেরা, সেই সঙ্গে কান্তিনাথের প্রাণটাও নিশ্চয়, তারই ছবি আজ পর্যন্ত তোলা হলো না। মাঝে কয়েকবার বিধুময়ীকে স্মরণ করিয়েও দিয়েছে কান্তিনাথ—সেই মেয়েটিকে ডাকতে আপনি বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন দিদি।

বিধুময়ী—না ভাই, ভুলি নি।

কিন্তু সাতদিন পার হয়ে যাবার পর আজ একটু বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কান্তিনাথ।--আর তো দেরি করা চলে না, দিদি। মেয়েটিকে একবার ডেকে নিয়ে আসুন।

বিধুময়ী হাসেন—ভাইটি একটু ব্যাকুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে!

কান্তিনাথ—তা সত্যি।

—কেন? একটু স্পষ্ট করে বল তো ভাই?

কান্তিনাথ—আমি শিল্পী, সুন্দর কিছু দেখতে পেলেই ছবি তুলে রাখি। এটা আমার আত্মার স্বভাব।

খিল খিল করে হেসে ওঠে অঞ্জলি—শিল্পী! আঃ, কী চমৎকার শিল্পী মশাইয়ের চেহারা! মাথার অর্ধেক টাক, পেট মোটা, আর মিশ্‌কালো রং। এ নাকি শিল্পীর চেহারা!

হেসে ধমক দেন বিধুময়ী—চুপ করলি, অঞ্জলি!

অঞ্জলি—শিল্পীর হবে চমৎকার ঢেউ-খেলানো চুল, বড় বড় টানা চোখ, ধবধবে ফরসা রং আর পাতলা লম্বা শরীর।

বিধুময়ী—কী বাচাল মেয়ে রে বাবা!

অঞ্জলি—শিল্পীর চেহারা হবে বিরজাদির বরের মত। বড়দিনের ছুটিতে এসেছিলেন। বীরবাঁধের কত ছবি এঁকে নিয়ে গেলেন। সুন্দর পাতলা লম্বা চেহারা, ভুঁড়ি-টুড়ি নেই।

হরনাথবাবু—অঞ্জলি, তুমি এখন একটু ওদিকে যাও, রেকর্ড-প্লেয়ার বাজাও।

অঞ্জলি চলে যেতেই বিধুময়ী বলেন—অসুবিধে এই যে, সুমিতা একটু বাঁকা স্বভাবের মেয়ে। ফটো তুলতে দিতে রাজী হবে কিনা সন্দেহ।

কান্তিনাথ—সুমিতা কে?

—ওই তো, ওই মেয়েরই নাম সুমিতা। যেমন দুর্ভাগ্য তেমনই দুরবস্থার মেয়ে। মা নেই, বাপ পঙ্গু অকর্মণ্য, ছোট-ছোট দুটো ভাইবোন আছে। স্কুলে ষাট টাকা মাইনের চাকরী করে মেয়েটা, তাই কোনমতে টেনে-টুনে ওদের দিন চলে।

কান্তিনাথ—তাই নাকি? তবে তো…

বিধুময়ী—কি?

কান্তিনাথ—বলছি, আপনি ওই মেয়েকে ফটো তোলা-টোলার কোন কথা বলবেন না। শুধু একবারটি ওকে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন।

বিধুময়ী—তারপর ?

কান্তিনাথ—তারপর আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিন।

বিধুময়ী হাসতে থাকেন—তারপর ?

কান্তিনাথ—তারপর আমার হাত-যশ আর আপনাদের···

হরনাথবাবু গলা খুলে হাসতে থাকেন—আমাদের ভাগ্যি, তাই না ?

কান্তিনাথ—আপনাদের আশীর্বাদ !

বিধুময়ী—এই কথাটা আগে বললেই তো ভাল করতে, ভাই।

হরনাথ—তোমার যে এতদিনে সংসার করবার জন্য ইচ্ছে হয়েছে, এটা আমাদের একটা ভাগ্যিই বটে।

বিধুময়ী—তাহলে আজই ওদের ওখানে গিয়ে, সুমিতার বাবা হেমন্তবাবুর কাছে···

কান্তিনাথ—না দিদি, এখনই ওখানে গিয়ে বিয়ের কথা তুলে কোন আলোচনা না করাই ভাল।

হরনাথবাবু—কেন বল তো ?

কান্তিনাথ কি যেন ভাবে আর হাসে।—তাহলে তো একটা সমস্যা বেধেই গেল। বিয়ের কথা শুনলে ওই মেয়ে কি আর আমার ক্যামেরার কাছে এসে দাঁড়াতে চাইবে ? কখ্খনো না।

বিধুময়ী—সেটা ঠিক কথা।

কান্তিনাথ—আপনি শুধু চেষ্টা করে কোনমতে সুমিতাকে এখানে নিয়ে এসে একবার হাজির করুন। আমার ইচ্ছে, আজ রাত্তিরে সুমিতাকে এখানে এসে খেয়ে যেতে নেমন্তন্ন করলে তবে সবচেয়ে ভাল হয়।

হরনাথ—বেশ বেশ, উত্তম প্রস্তাব !

বিধুময়ী—তাই হবে। কিন্তু···

কান্তিনাথ—বলুন দিদি, বলুন ! আমার কাছে নিঃসঙ্কোচে বলবেন।

বিধুময়ী—বিয়ে যেদিন হয় হোক, আপাতত হেমন্তবাবুদের একটা উপকার না করলে তো ভাল দেখাবে না!

কান্তিনাথ—বলুন, কী উপকার করতে চান?

হরনাথ—হেমন্তবাবু হলেন, যাঁকে বলে, নিতান্ত একজন দুঃখী নিরন্ন মানুষ। আমি ওঁর উপকার করবার জন্যে ওঁর বাড়িটা উচিত দামের কিছু বেশি দাম দিয়ে কিনে নিতে চাই। তার মানে, এই ধর, চোদ্দ-পনেরো হাজার টাকা।

দুই চোখ বড় করে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে কান্তিনাথ। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে আক্ষেপ করে ওঠে।—উপকার করতে হলে উপকারই করতে হয়। বাড়ি কিনে-টিনে নেবার কোন মানে হয় না। আপনি কালই হেমন্তবাবুকে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে দিন।

চমকে ওঠেন হরনাথবাবু—আমি···আমি আমার পক্ষে কি···

বিধুময়ী—সাধ্যি থাকলে ও সম্ভব হলে কি দিতাম না, ভাই?

হেসে ফেলে কান্তিনাথ—টাকা দিতে আপনাদের বলছি না। আমিই দেব। আমি কি বুঝতে পারি না যে, আপনাদের সামান্য সঞ্চয় থেকে পনেরো হাজার টাকা দান করা সম্ভবই নয়?

হরনাথবাবু—আমার সঞ্চয় বলতে যা আছে, সেটা দশ হাজারও নয় কান্তি। মাত্র সাত হাজার। অঞ্জলির বিয়ের জন্য···

কান্তিনাথ—চুপ করুন জামাইবাবু। অঞ্জলির বিয়ের জন্য টাকার কথা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি বেঁচে আছি কী করতে? অঞ্জলির বিয়েতে এসে শুধু লুচি-সন্দেশ খেয়ে যেতে?

বিধুময়ী—আমি তো এই কথাই তোমার জামাইবাবুকে বার বার বলেছি, কান্তি থাকতে টাকার চিন্তা করো না।

কান্তিনাথ—অঞ্জলির বিয়ের গয়না-টয়না কিছু গড়িয়ে রেখেছেন, না, তাও করেন নি?

বিধুময়ী—গড়িয়ে রেখেছি।

কান্তিনাথ—দিদি বোধহয় নিজের গায়ের গয়না ভেঙে মেয়ের এইসব গয়না গড়িয়েছেন ?

বিধুময়ী—না, ভাই। আমার যা আছে, আছে। অঞ্জলির জন্য সবই নতুন কেনা হয়েছে। বরের জন্য হীরের আংটিও কেনা আছে।

কান্তিনাথ—মোট দামের হিসাবটা বলুন।

বিধুময়ী—এগারো হাজার। আমার ওই বোঁচা-নাক কালো মেয়ে, গা ভরে গয়না না দিলে ভাল ঘরের ছেলে পাওয়া তো সহজ হবে না !

কান্তিনাথের চোখ দুটো চিকচিক করে।—বুঝলাম, সবই বুঝলাম।

হরনাথবাবু—হেমন্তবাবুর উপকারের জন্য যে টাকাটা দিতে চাও, সেটা কি আজই দেবে ?

কান্তিনাথ—না, কাল। আমার কাছে অবিশ্যি পুরো পনেরো হাজার টাকা এখন নেই। মাত্র পাঁচ হাজার আছে। এই পাঁচ হাজারই কাল দিয়ে দেবেন।

হরনাথবাবু—যথেষ্ট। এ যুগে এই পৃথিবীতে কে কার এমন উপকার করে ?

কান্তিনাথ—তবে এখনই হেমন্তবাবুকে বলবার দরকার নেই যে, টাকাটা আমি দিয়েছি। বলবেন, আপনিই দিচ্ছেন।

হরনাথ—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মনে করি, আপাতত হেমন্তবাবুকে এই কথাই বলা উচিত।

কান্তিনাথ আবার লজ্জিতভাবে হাসে।—তাহলে আজই···

হরনাথ—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার দিদি আজই গিয়ে মেয়েটিকে এখানে রাত্তিরে এসে খেয়ে যাবার নেমন্তন্ন করে আসবে।

নেমন্তন্ন করে আসতে দেরি করলেন না বিধুময়ী। বীরবাঁধের পাহাড়ের গায়ের উপর তখন ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলোকের আভা লাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়েও কান্তিনাথ নামে

শিল্পী মানুষটির চোখে কোন আগ্রহের চঞ্চলতা নেই। ঘরের ভিতরে খাটের উপর শুয়ে পড়ে আর দুই চোখ বন্ধ করে যেন সন্ধ্যার আবছায়া আর রাত্রির অন্ধকারকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনবার জন্য তপস্যা করছে।

ওদিকে হেমন্তবাবুর বাড়টা, ওই ডুবন্ত সূর্যের আভা লেগে নয়, হরনাথবাবুর স্ত্রী বিধুময়ীর কথা শুনে যেন চমকে উঠে রঙীন হয়ে উঠল। সত্যিই, সুমিতার চোখ দুটো হঠাৎ লাল হয়ে গেল।

বিধুময়ী হাসেন—শুনে লজ্জা পেলে নাকি, সুমিতা? লজ্জা করবার কি আছে? অঞ্জলির জন্মদিনে, ছাই মনের ভুলে, তোমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আজ ইচ্ছে হলো, সুমিতাকে ডেকে একটু খাওয়াই। যেও কিন্তু সুমিতা, ভুলে যেও না, আমরা সবাই তোমার আশায় না খেয়ে বসে থাকবো।

সুমিতা—কিছু মনে করবেন না, মাসিমা। আমি যেতে পারবো না।

বিধুময়ী—যেতে হবে। মাসিমার ভালবাসার ডাক তুচ্ছ করা কি উচিত হবে?

সুমিতা—না মাসিমা। রাণু আর ভানুকে বাদ দিয়ে আমি নেমন্তন্ন খেতে পারবো না।

চমকে ওঠেন বিধুময়ী—অ্যাঁ? এ কিরকম কথা হলো? ও হ্যাঁ, তা বটে। রাণু ও ভানুকে আর একদিন খাওয়াবো। আজ শুধু তুমি···

সুমিতা—না, মাসিমা।

বিধুময়ী—তবে ওরাও যেন যায়।

সুমিতা হেসে ফেলে—না। ওরা যেতে রাজী হবে না।

হেমন্তবাবুর কাছে এসে আবেদন করেন বিধুময়ী—দাদা, আপনি এই মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলুন। এতদিনের চেনা-জানা মাসিমা ভালবেসে ডাকছে, তবু যেতে রাজী হচ্ছে না মেয়ে। চারুদি বেঁচে থাকলে সুমিতা কি আমার কথার এমন অবাধ্যতা করতে পারত?

হেমন্তবাবু—না না, আপনার কথার অবাধ্যতা করবে সুমি? কখ্‌খনো না! আপনি এত আদর করে যেতে বলছেন, যাবে না কেন? নিশ্চয় যাবে।

বিধুময়ী—তাহলে আমি যাই। কথা রইল, আপনি সুমিতাকে পাঠিয়ে দেবেন। ওঃ, চারুদি নেই, ভাবতেই মনটা কেঁদে ওঠে। সেই জন্যেই তো বার বার সুমিতাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

এক ঢিলে তুই পাখি মারবার চমৎকার আশায় প্রাণটা সন্ধ্যা হতেই যেন বিহ্বল হয়ে যায়। বাইরের বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আছে কান্তিনাথ। সেই চেয়ারের পাশে আর-একটা চেয়ার নিজেই টেনে নিয়ে রেখেছে। ঘরের ভিতরে বিধুময়ীর কাছে দাঁড়িয়ে খুব মৃত্নস্বরে কথা বলেন হরনাথ।—এক ঢিলে তুই পাখি মারা, কথাটা শুনতে খারাপ। কারণ, কথার ভাষাটা খারাপ। আসল কথা এই যে, আমাদের চেষ্টাতে যেমন সুমিতার উপকার করা হলো, তেমনই কান্তিরও উপকার করা হলো, তাই না? তুমি কি বল?

মুখ টিপে হাসেন বিধুময়ী—আমিও তাই বলি।

আরও মুখ টিপে হাসেন হরনাথ।—তাছাড়া, হেমন্তবাবুকে দান করবার টাকাটা আপাতত আমাদেরই হাতে···।

কিন্তু রাত ন'টার ট্রেন চলে গেলেও সুমিতা এল না। ছটফট করেন হরনাথ আর বিধুময়ী। ধীর স্থির ও শান্ত হয়ে বারান্দার চেয়ারের উপর বসে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকে কান্তিনাথের শিল্পী চোখ।

—নাঃ! কান্তিনাথের হতাশ কণ্ঠস্বর ক্ষিপ্ত হয়ে বেজে উঠতে গিয়েই আবার মৃত্নু হয়ে যায়। যেন কান্তিনাথের মনেরই ভিতরে একটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলে উঠে নিভে গিয়েছে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় কান্তিনাথ। দশটা বেজে গিয়েছে। —নাঃ, আর অপেক্ষা করে লাভ কি?

উদ্বিগ্ন হয়ে আর ব্যস্ত হয়ে হরনাথ আর বিধুময়ী তুজনেই

কান্তিনাথের কাছে এসে দাঁড়ায়। বিধুময়ী বলে—কী যে হলো কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

কান্তিনাথ হেসে ফেলে—যাক্, না এলে আর কী করা যাবে? আমি শুধু একটা চান্স নিতে···তার মানে সুমিতার মনের ইচ্ছেটাকে একটু বাজিয়ে দেখতে···যাক্, এসব কথা তুলে এখন আর লাভ নেই।

হরনাথ—তা হলে কাল সকালে আমিই না হয় একবার গিয়ে···

কান্তিনাথ—না, আর ডাকাডাকি করবেন না। বিয়ের কথাটাই সোজাসুজি বলবেন।

হরনাথ—তাই ভাল। হেমন্তবাবুকে স্পষ্ট করে বলে দিলেই হবে যে, আপনার সব দুঃখের অবসান করে দিতে পারবে, এমনতর অবস্থার একটি পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান তো দিন।

কান্তিনাথ আবার লজ্জিতভাবে হাসতে থাকে—একথা বললেই কি ওঁরা রাজী হয়ে যাবেন!

বিধুময়ী—হা-ভাতে মানুষ, রাজী আবার হবে না! কী যে বল!

কান্তিনাথ—তবে তাই হোক।

বিধুময়ী—হ্যাঁ। চল ভাই, এবার খেয়ে নাও।

রিমঝিম শব্দ করে রাত্রির ঘুম নিবিড় করে দিয়ে এরকম বৃষ্টিপাত বীরবাঁধের কোন বর্ষার দিনেও দেখা দেয় নি। হরনাথের নিবিড় ঘুম হঠাৎ যখন ভেঙে গেল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রিমঝিম শব্দ আর নয়, ঝড়ের শব্দ উদ্দাম হয়ে ছুটোছুটি করছে। নীচের তলার একটা দরজার কপাট যেন মাথা ঠুকে ঠুকে শব্দ করছে।

চমকে উঠলেন হরনাথ। দরজার কপাট শব্দ করে কেন? দরজা কি বন্ধ নয়?

ঠিকই, দেখতে পেলেন হরনাথ, দরজা বন্ধ নয়। ঝড়ের বাতাসে খোলা দরজার কপাট ছটফটিয়ে শব্দ করছে আর বৃষ্টির জল ঘরের মেঝে ভাসিয়ে দিয়েছে।

যেন হরনাথের মেরুদণ্ডটাকে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে একটা আর্ত

চিৎকার হরনাথের বুকের ভিতর থেকে বের হয়ে বেজে উঠল—এ কি সর্বনেশে কাণ্ড!

সব ঘর খুঁজে দেখলেন হরনাথ, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন বিধুময়ী, ভাই কান্তিনাথ কোন ঘরেতেই নেই। স্টীল আলমারির চাবিটা ঘরের মেঝের উপর পড়ে আছে। আলমারির ভিতরে গয়নার কোন চিহ্ণও নেই। নগদ সাতটি হাজার টাকার একটি টাকাও নেই।

তিন

বীরবাঁধের আকাশ বড়ই পরিছন্ন। রাত্রি গভীর হলে রিমঝিম করে নিবিড় বৃষ্টির ধারা আর ঝরে পড়ে না। রাত্রির বীরবাঁধের ঘুম নিবিড় করে দেয় রাতের পাখির শিস। তারায় ভরা রাতের সারা আকাশটাই যেন ঝিকমিক করে। সকাল হলে ঝলমল করে জেগে ওঠে বীরবাঁধের রোদ। দশদিন ধরে এইরকম একটা শুকনোর টানে বীরবাঁধের স্যাঁতসেঁতে মাঠ আর সড়ক খটখটে হয়ে গিয়েছে। মুকুটধারীবাবুর জীপ আর কাদা ছিটিয়ে দৌড়য় না, ধুলো ওড়ায়।

দুপুরবেলার ট্রেনে কলকাতা থেকে বীরবাঁধে ফিরে এসে, স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে, ভয়ানক শুকনো চেহারা নিয়ে আর ধুলোমাখা হয়ে যখন বাড়ির ফটকের কাছে এসে থামলেন আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন হরনাথ, তখন দৃশ্যটাকে অনেক দেখেও বুঝতে পারে নি, ভদ্রলোক এরকম করে টলে উঠলেন আর পড়ে গেলেন কেন? অসুখের ব্যাপার, না শোকের ব্যাপার? হরনাথের চেহারা দেখে সন্দেহ করতে হয়, নিশ্চয় খুব কঠিন একটা শোকের আঘাত পেয়েছেন।

সবার আগে জানতে পারলেন প্রিয়নাথবাবু। না, শোক-টোকের কোন ব্যাপার নয়।

কলকাতা পুলিসের একজন অফিসার, প্রিয়নাথবাবুর ভাইপো সুধাকর এসে বললেন—আমি কালই বীরবাঁধে এসেছি, সেজকাকা। থানাতেই ছিলাম? তদন্তের কাজটা শেষ হয়ে গেল, তাই হাঁফ ছেড়ে আজ এখানে আসতে পারলাম। কাকিমা কই? মণিকা কোথায়?

—কিসের তদন্ত?

সুধাকর—একটা লোক, একবছর হল নিউ আলিপুরের এক ভদ্রলোকের বাড়ির কেয়ার-টেকার হয়ে কাজ করতো, নাম হলো বলাই দাস, দিলীপ মিত্র, কান্তি চৌধুরী, কটুবাবু আর আরও কত কী, সে একটি পাকা ক্রিমিনাল। অনেক সাংঘাতিক জোচ্চুরির কীর্তি করে পলাতক হয়েছে। সে ব্যাটা ক'দিন আগে আপনাদের এই বীরবাঁধের হরনাথ রায় নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছিল। ভদ্রলোকের আলমারি ভেঙে সব ক্যাশ আর গয়না নিয়ে জোচ্চোরটা সরে পড়েছে।

—কী আশ্চর্য, এখানে আমরা কেউ তো এ ঘটনার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারি নি!

সুধাকর—জানবার কথা নয়। ভদ্রলোক বীরবাঁধের থানাতে ঘটনার কোন কথাই জানান নি। কলকাতাতে জোচ্চোরটার কাছে এই ভদ্রলোকের লেখা কয়েকটা চিঠির লেখা থেকে ক্লু পেয়ে আমি চলে এসেছি আর তদন্ত করেছি। ভদ্রলোক কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছেন—আমার সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়েছে মশাই! ভদ্রলোকের জন্য সত্যই খুব দুঃখ হয়।

—হ্যাঁ, দুঃখ হবারই কথা। যেমন ধর, ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়ে আমারও মনটা দুঃখিত হয়েছিল। সুয়োরাণীর প্রাণের লোভ আর আশা দুই-ই বড় প্রবল। মায়াপুকুরের জলে এক ডুব দিয়ে উঠেই দেখতে পেলেন সুয়োরাণী, সোনার গয়নাতে গা ভরে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর-একবার ডুব দিয়ে উঠলেন। এইবার দেখলেন, হীরের গয়নাতে গা ভরে গিয়েছে। কিন্তু সুয়োরাণীর আশা থামতে চায় না। আর একবার ডুব দিয়ে উঠলেন। কিন্তু হায় হায়, বড় বড় আঁচিলে সুয়োরাণীর গা ভরে গিয়েছে! আমাদের হরনাথও লোভ আর আশা সামলাতে পারে নি। তিন ডুব দিতেই সারা গা আঁচিলে ভরে গিয়েছে।

—আমারও এইরকম ধারণা হয়েছে। যাক্ গে…। বলতে

বলতে ঘরের ভিতরে চলে যায় সুধাকর, কাকিমার সঙ্গে গল্প করতে থাকে।

অঞ্জলির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরও কিছু খবর পেয়ে গিয়েছেন অলকার মা।

—কী খবর অঞ্জলি, তোমার কটুমামার খবর কী?

অঞ্জলি—কটুমামা ভয়ঙ্কর একটি ইয়ে মানুষ।

চমকে ওঠেন অলকার মা—কী বললে?

অঞ্জলি—ভয়ঙ্কর অভিমানী মানুষ। শিল্পীরা ভয়ানক অভিমানী হয়, তাই না কাকিমা? অভিমান করে কাউকে না বলে একদিন ভোর না হতেই চলে গিয়েছেন।

—কেন আর কিসের জন্যই বা অভিমান করলেন কটুমামা?

অঞ্জলি—সুমিতাদির জন্য।

—তার মানে? আবার চমকে উঠলেন অলকার মা।

অঞ্জলি—সুমিতাদির সঙ্গে একটু ভাব-সাব করতে চেয়েছিলেন কটুমামা। মা বললেন, হ্যাঁ, ভাব-সাব করিয়ে দেওয়া হবে। সেই জন্যে সুমিতাদিকে নেমন্তন্ন করে এলেন মা। কিন্তু সুমিতাদির স্বভাবে ভদ্রতা বলে তো কিছু নেই। তাই না কাকিমা?

—সুমিতা বুঝি খুব অভদ্রতা করেছে?

অঞ্জলি—এলই না। রাত দশটা পর্যন্ত আমরা সবাই অপেক্ষা করলাম। কিন্তু এল না সুমিতাদি। ক্ষতি কিন্তু সুমিতাদিরই হলো। আমাদের কোন ক্ষতি হয় নি।

—ক্ষতি?

অঞ্জলি—হ্যাঁ, কটুমামার সঙ্গে সুমিতাদির বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে হবে কী করে? সুমিতাদি ইচ্ছে করেই অভদ্রতা করে ভাগ্যটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাই না কাকিমা?

হেসে ফেলেন অলকার মা।—আমারও সেইরকম সন্দেহ হচ্ছে।

রহস্যের গোপন কথা অলকার মা যেটুকু জানতে পেরেছেন, তা

ছাড়া এবং তার চেয়ে বেশি আরও কিছু কথা জানতে পেরেছে অলকা।

অলকা বলে—একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, মা।

—কী?

অলকা—বিধুমাসী সুমিতাকে নেমন্তন্ন করেছিল, কিন্তু সুমিতা নেমন্তন্নের লুচি খেতে বিধুমাসীর বাড়িতে যায় নি।

—শুনেছি।

অলকা—কিন্তু কেন যায় নি, বলতে পার?

—না।

অলকা—তবে শোন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিছানার উপর পড়ে হেমন্তকাকা অসাড় ঘুমের মধ্যেই চমকে জেগে উঠলেন আর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—না না, যাবে না সুমিতা, তুমি রাগ করো না, চারু!

স্বপ্ন দেখেছিলেন হেমন্তকাকা, সুমিতার মা রাগ করে কথা বলছেন, মেয়েটাকে তুমি কি মরবার জন্যে ওদের বাড়িতে যেতে বলছো? সাবধান, ওরকম ভয়ানক নেমন্তন্নে আমার মেয়েকে কখ্‌খনো যেতে বলবে না!

—তুই কোথায় শুনলি এসব অদ্ভুত কথা?

অলকা—সুমিতার কাছ থেকে শুনেছি।

হেমন্তবাবুর স্বপ্নের কথা শুনে চমকে ওঠে নি সুমিতা। সুমিতা শুধু হেমন্তবাবুর বুকে হাত বুলিয়ে আর হেসে হেসে বলেছে—তুমি ঘুমোও। আর স্বপ্নে যদি মা আবার আসে, তবে বলে দিও, ও বাড়িতে আমি যাব না, যেতামও না। তুমি বললেও যেতাম না।

হেমন্তবাবু হেসেছেন—এরকম স্বপ্ন-টপ্ন বোধহয় মনেরই রোগ। তুই কী মনে করিস, সুমি?

—আমি কিছু মনে করতে চাই না, পারিও না। আমি শুধু বুঝেছি, বিধুমাসীর নেমন্তন্নকে ভয় করা উচিত।

হেমন্তবাবু—কেন রে?

—অঞ্জলির জন্মদিনের নেমন্তন্নে রাণু আর ভানুকে যেতে না বলে, শুধু আমাকে যেতে বললে, ভয় তো করতেই হয়!

রাণু বলে—শুধু তো ভয় নয়, আরও মজার বাধা পেয়েছে দিদি, তাই যেতে পারে নি।

হেমন্তবাবু—সে কী?

রাণু—সন্ধ্যা হবার পরেই কোত্থেকে দুটো ইয়া মোটা চেহারার শেয়াল এসে ফটকের বেড়ার দুদিকে বসে রইল। যেন দুটো দরোয়ান। বাইরে থেকে কাউকে আসতে দেবে না, কাউকে বাড়ির বাইরে যেতেও দেবে না।

ভানু বলে—আমিও দেখেছি। মেঘের বিদ্যুৎ এক-একবার চমকে উঠছে, কিন্তু শেয়াল দুটো একটুও চমকে উঠছে না। চুপ করে বসে রয়েছে।

হেমন্তবাবু হাসেন—হ্যাঁ, আশ্চর্য, খুবই মজাব বাধা বলতে হবে!

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন হেমন্তবাবু। বাঁ হাত দিয়ে পক্ষাঘাতের ডান হাতটাকে চেপে ধরেন, চোখ দুটো ছলছল করে।—আমি কোনদিনও বিশ্বাস করি নি সুমি, কিন্তু আজ বিশ্বাস করছি।

সুমিতা—কিসের বিশ্বাস?

হেমন্তবাবু—ঈশ্বরই রক্ষা করেন। আর কেউ রক্ষা করে না। করতে পারেও না।···তুই বিশ্বাস করিস তো, সুমি?

সুমিতা—করি বৈকি!

হেমন্তবাবু—সারা জীবন এই বিশ্বাস ধরে রাখিস। মনে রাখবি, তোকে রক্ষা করবার জন্যে এমন একজন আছেন, যাঁর জোরের উপর কারও জোর, যাঁর ইচ্ছার উপর কারও ইচ্ছা, যাঁর বুদ্ধির উপর কারও বুদ্ধি চলে না!

সুমিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল অলকা।—তোমরা কি সারারাত জেগে এইরকম গল্প করতে করতে···

সুমিতা বলেছে—না ভাই। যখন রিমঝিম করে বৃষ্টি শুরু হলো আর···

ভানু—শেয়াল দুটো চলে গেল।

হেসে ফেলে সুমিতা—তখন আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমরা কেউ একটুও ভয় পাই নি।

অলকাও হাসতে থাকে।—চলি এবার, যে-কথাটা বলতে এসেছিলাম, সেটা আর না-ই বা বললাম!

সুমিতা—বুঝেছি. বলবার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে।

অলকা—সত্যি, তুমি কথাটা শুনেছ নাকি, সুমিতা?

সুমিতা—শুনেছি বৈকি! রঘুর মা পর্যন্ত শুনেছে যখন, তখন আমারই বা শুনতে বাকি থাকবে কেন?

অলকা—যা ভয় করেছিলাম সুমিতা, তাই এবার হতে চললো।

সুমিতা—ভয়?

অলকা—একদিন তো ভূতে ধরবেই জানতাম, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আর হঠাৎ ধরে ফেলবে, সেটা বুঝতে পারি নি।

সুমিতা—শুনেছি, ভদ্রলোক নাকি চমৎকার মানুষ!

অলকা—হ্যাঁ, চমৎকার একটি চাকরি করেন আর দেখতে-শুনতে ভাল।···কিন্তু···কিন্তু শুনছি, আর দুটি মাস পরেই একটি শুভদিনে আমাকে ভূতে ধরতে আসবে। এত তাড়াতাড়ি না ধরলেই ভাল ছিল। সত্যি, বেশ ভয় করছে!

সুমিতা—শুভদৃষ্টির সময় একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখবে, তাহলেই ভয় ভেঙে যাবে।

অলকা—সবই তো বুঝতে পার দেখছি, তবে নিজে কেন···

অলকা হঠাৎ কথার আবেগ থামিয়ে দিয়ে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, অলকার দুই চোখে যেন একটা চাপা বিস্ময় করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে।

হেসে ফেলে সুমিতা।—তুমি ভেবো না অলকা। আমাকে কোনদিনও ভূতে ধরবে না।

অলকা—যদি ধরতে চেষ্টা করে?

সুমিতা—পারবে না। কোন ভূতের সাধ্যি নেই যে, আমাকে ধরে।

অলকা—এটা বোধহয় তোমার···না, অহঙ্কারের কথা নয়, বোধহয় অভিমানের কথা।

সুমিতা—হতে পারে।

চলে গেল অলকা। বারান্দার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে পলাশের মাথার ছিন্নভিন্ন চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকে সুমিতা। সেই রাতের ঝড়ে পলাশের মাথাটার যে ছেঁড়া-ছেঁড়া দশা হয়েছিল, সে দশা এখনও কেটে যায় নি। কথাটা বলতে গিয়ে অলকা যদিও মুখ টিপে হাসে নি, কিন্তু কথাটাই যেন মুখ টিপে হেসেছে। অলকাকে বলে দিলেই ভাল হতো, না অলকা, এটা আমার অহঙ্কারেরই কথা। এই দুঃখের বাড়িটাকে হাসিয়ে আর দাঁড়িয়ে রাখা ছাড়া আমার জীবনে আর কোন কাজ নেই, আর কোন ইচ্ছেও নেই। ওরকম কোন ইচ্ছে রাখাই তো একটা পাপ।

অলকা নিশ্চয় বিশ্বাস করে না, অলকার মা আর মণিকার মা-ও বোধহয় বিশ্বাস করবেন না যে, হেমন্তবাবুর মেয়ে সুমিতার এই ষাট টাকা মাইনে নিয়ে চাকরি করবার ভাগ্যটার মধ্যেই অনেক আনন্দ আছে। অলকা বুঝতে পারবে না, সেটা কেমনতর আর কিসের আনন্দ। তিন বছর ধরে যে-মেয়ে বিয়ের কথা শুনছে, পাত্রের ফটো দেখছে আর পছন্দ-অপছন্দের কথা লজ্জা করে বললেও বলে দিচ্ছে, তার পক্ষে সুমিতার মনের অহঙ্কারের আনন্দটা কল্পনা করা সম্ভবই নয়। প্রিয়নাথবাবু আক্ষেপ করে বলেন—হেমন্তর সুমিতা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো, তবে হেমন্তর জীবনে তবু একটা আশা করবার জোর থাকতো। বড়ছেলে নয়, বড়মেয়ে, তা'ও বাইশ বছর বয়সের

একটা মেয়ে, যে-মেয়ের লেখাপড়ার ভাগ্যটাও এগুতে পারলো না, সে মেয়ের কাছ থেকে কী আর কতটুকু সাহায্য পেতে পারে হেমন্ত? বুঝতে পারে না সুমিতা, প্রিয় জেঠামশাই কেন এরকমের অদ্ভুত কথা বলেন।

অলকার বাবা পার্বতীবাবু একেবারে স্পষ্ট ভাষায় সমস্যার আসল কথাটা বলে ফেলেন।—মেয়ের যখন বিয়ে হয়ে যাবে, তখন হেমন্তর কী উপায় হবে?

অলকার মা—বিয়ে হওয়াও তো মুশকিল!

—কেন?

অলকার মা—বিয়ে দেবার টাকা কোথায় পাবেন হেমন্তবাবু?

—টাকার অভাবের সমস্যা না হয় চাঁদা করে, বীরবাঁধের আমরা সবাই কিছু কিছু দিয়ে, মিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হলো, তারপর? তারপর তিনটে পেটের ভাত আসবে কোথা থেকে?

অলকার মা—এমন পাত্র কি পাওয়া যায় না, যে···

অলকার মা'র মুখের কথা লুফে নিয়ে পার্বতীবাবু ঠাট্টার স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—যে পাত্র শ্বশুরবাড়ির তিনটে মানুষেরও ভরণপোষণের ভার বইবে! তুমি তো, এই কথাই বলতে চাইছো?

অলকার মা—হ্যাঁ।

—তা হয় না। অসম্ভব। এরকম কিছু আশা করা আর আশা না-করা, দুই-ই সমান। হ্যাঁ, জনার্দনের ভাই শর্বরীকান্তের মত জামাই যদি হয়, তবে শ্বশুরবাড়ির ভার বইবার দায় জামাই ঘাড়ে তুলে নিতে পারে। বয়স পঞ্চাশের কিছু কম, বিপত্নীক, টাকা আছে, ভাল কারবারও আছে, এই শর্বরীকান্তের মত পাত্র ছাড়া আর কেউ হেমন্তবাবুর মেয়ে সুমিতাকে বিয়ে করতে চাইবে না।

অলকার মা—শর্বরীকান্ত সত্যিই কিছু বলেছে নাকি?

—বলেছে। প্রিয়দাকে অনেক করে বলেছে, হেমন্তবাবুর মেয়ের

সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়, তবে দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে হেমন্তবাবুকে আর খাওয়া-পরার ভাবনা করতে হবে না।

অলকার মা—তোমরা কি চাও?

—আমরা চাই, শর্বরীকান্তের সঙ্গে সুমিতার বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল।

অলকার মা—চেষ্টাও করছো নাকি?

—চেষ্টা করতে হবে।

অলকার মা—প্রিয়বাবু কী বলেন?

—উনি তো ওই একটি ন্যাকা কথা বলেন, না হে পার্বতী, এটা ভাল দেখায় না। আরে, আমিও তো বলি, এটা ভাল দেখায় না। কিন্তু মেয়েটা বাপের সংসারের পেট চালাবার জন্য খেটে খেটে শেষে একদিন···সেদিন ওই বুড়ি কুমারীকে বিয়ে করতে কোন বুড়োও রাজী হবে না।

সুমিতা কি তার ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ নিয়ে বীরবাঁধের এইরকম এক-একজন পার্বতীবাবুর চিন্তার সব কথা শুনতে পেয়েছে? পেয়েছে নিশ্চয়। তা না হলে পার্বতীবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হতেই ওরকম করে হঠাৎ মাথা হেঁট করে মুখ লুকিয়ে ফেলে কেন সুমিতা?

রঘুর মা, দুধ বিক্রী করে যে ছাপরাই গয়লা রঘু, তারই মা কী করে যে বীরবাঁধের সব বাঙালী বাড়ির হাঁড়ির খবর পেয়ে যায়, আর বাংলা ভাষার সব মর্ম বুঝে ফেলতে পারে, তা সে-ই জানে। রঘুর মাকে অনেকবার বলেছে সুমিতা, তুমি আমার কাছে ওসব খবর শোনাবে না। আমার শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু বুড়ি রঘুর মা'র কাছে এই কাজটাই যেন ওর জীবনের সবচেয়ে সুস্বাদু ব্রত। রঘুর মা বলে—আমি শোনাবো না তো কে শোনাবে?

—আমাকে শোনাবে না।

রঘুর মা—তোমাকে শোনাবো না তো কাকে শোনাবো? তোমার মা তো বেঁচে নেই।

—না, আমাকে কখ্খনো কিছু বলবে না।

রঘুর মা—আমি তো বলতে চাই না, কিন্তু বলে ফেলি। কী করবো বল? কে যেন জোর করে আমাকে দিয়ে কথা বলায়।

—তা হলে বলতে থাক। আমি রান্না করতে চললাম।

রঘুর মা—সেই কথাই তো বলতে চাই। অলকার মা বলছিলেন, সুমিতা ছবেলা রান্না করে, বাসন মাজে, আর কয়লা ভাঙে, তবু মেয়েটার হাতে কড়া পড়ে না। আর, অলকার বাবা কী বলেন, শুনবে? অলকার বাবা বলেন, মেয়েটার মনে তো কড়া পড়ে নি। একটু ভাল করে খেয়ে-পরে সুখে থাকবার সাধ কি নেই?

রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে সুমিতা—না, নেই।

রঘুর মা বলে—আমি এখন যাই, দিদি। আবার আসবো।

রঘুর মা চলে যেতেই চমকে ওঠে সুমিতা। একটা শব্দের ধাক্কা লেগে বারান্দা কেঁপে উঠেছে। পশ্চিমের ঘরের একদিকের দেয়াল ধসে পড়ে গেল। চালটা কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। চালার টালি হুড়হুড় করে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছে। আর কাকের একটা দল ভয় পেয়ে উড়ছে বসছে ও চিৎকার করছে।

ভয় পেয়েছেন হেমন্তবাবু—কী হলো? কী হলো?

ভয় পেয়েছে রাণু আর ভানু—মা গো!

রাণু আর ভানুকে ছহাতে জড়িয়ে ধরে হেসে ওঠে সুমিতা।—কী হলো? কিসের ভয়? একটা দেয়াল ধসে গেল তো বয়ে গেল!

শুধু মনে নয়, বাইশ বছর বয়সের এই মেয়ের প্রাণেও বোধহয় বেশ শক্ত একটা কড়া পড়ে গিয়েছে। নইলে এই মেয়ে একটু ভয় পেত নিশ্চয়, ওরকম করে হেসে উঠতে পারত না।

ধুলো উড়ছে পলাশতলায়। একটা টাঙ্গা এসে বাড়ির সামনে সড়কের উপর নেমেছে। রাণু আর ভানুর ভীতু চোখ ছটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে হেসে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে রাণু—মহীকাকা, মহীকাকা এসেছে!

হ্যাঁ, ঠিকই, সেই মহীকাকা এসেছেন, হেমন্তবাবুর খুড়তুতো ভাই সেই মহীতোষ, চারটি বছর পাটনাতে কলেজে পড়বার সময় যাঁর হোস্টেলের সব খরচ আর কলেজের ফীয়ের টাকা দিতেন হেমন্তবাবু। চারুবালার মৃত্যুর পর এই দেড় বছরের মধ্যে একটিও চিঠি দেন নি যে মহীকাকা, কী আশ্চর্য, তিনি আজ এসেছেন! কেন এসেছেন?

হাতে শুধু একটা টিফিন-কেরিয়ার, মহীকাকার হাতে আর কোন বস্তু নেই। বেশ চিন্তান্বিত একটি মূর্তি, কিন্তু সে মূর্তির দুই চোখে বেশ শাণিত একটা কৌতূহল ঝিকঝিক করছে।

বারান্দাতে উঠেই চেঁচিয়ে ওঠেন মহীকাকা—চা, শিগ্‌গীর এক পেয়ালা চা খাওয়া দেখি, সুমি।

সুমিতা হাসে।—শিগ্‌গীর করতে অসুবিধে নেই কাকা, কিন্তু গুড়ের চা। খেতে পারবেন তো?

চমকে ওঠেন মহীতোষ, চোখের দৃষ্টিটা আরও শাণিত হয়ে ঝিকঝিক করে।—না, গুড়ের চা খাব না। কিছুই খাব না। দু'তিন ঘণ্টার বেশি থাকবোও না। আমি শুধু বুঝতে এসেছি, তুই সত্যিই আস্ত একটা পাগল হয়ে গিয়েছিস কি না।

সুমিতা—আপনি বোধহয় রাগ করে কথা বলছেন, কাকা।

মহীতোষ—রাগ করবো বৈকি! তুই কোন্ লজ্জায় আমাকে ওরকম একটা মহাজনী মেজাজের চিঠি লিখেছিস? হেমন্তদা তোকে এরকম বিশ্রী নির্লজ্জ কাজ করতে বলেছেন বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না।

সুমিতা—ঠিক কথা। বাবা আমাকে বলেন নি, আমি নিজেই ইচ্ছে করে আপনাকে ওই চিঠি লিখেছি।

মহীতোষ—টাকা চেয়ে চিঠি লিখলেই কি টাকা পাওয়া যায়?

সুমিতা—আমি তো আপনার কাছে টাকা চাই নি। আপনি বাবার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছেন, সেই টাকা শোধ করে দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছি।

মহীতোষ—শোধ করে দেব। কিন্তু কই? হ্যাণ্ডনোটটা একবার দেখি।

লাঠিতে ভর দিয়ে পা দুটোকে টেনে টেনে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন হেমন্তবাবু। মহীতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখিতভাবে কথা বলেন।

—সে হ্যাণ্ডনোট হারিয়ে গিয়েছে, মহীতোষ।

সুমিতা—না, হারিয়ে যায় নি। আমি খুঁজে পেয়েছি। বাক্সের ভিতরে তোমার গরম কোটের পকেটের মধ্যে সেই হ্যাণ্ডনোট পেয়েছি।

হেমন্তবাবু—কিছু মনে করো না মহী, মনে আছে তো, আমি তোমার কাছ থেকে কোন হ্যাণ্ডনোট নিতে চাই নি। তুমিই ইচ্ছে করে আমাকে ওই হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছিলে।

মহীতোষ—টাকাটা আপনাকে যেন শোধ করে দিতে বাধ্য হই, আমি ইচ্ছে করে নিজেকে বাধ্য করে রাখবার জন্যেই হ্যাণ্ডনোট লিখে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলাম। তা ছাড়া, আপনি যেন বিশ্বাস করেন যে, টাকাটা একদিন আমি শোধ করে দেবই দেব, সেই জন্যে হ্যাণ্ডনোট লিখেছিলাম। নইলে, আমি কি জানি না যে, ভাইকে দরকারের সময় সামান্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে গিয়ে দলিলবাজী করবার মত মানুষ নন হেমন্তদা।

হেমন্তবাবু—বেশ তো, ওসব কথা থাকুক। তুমি বরং এখন একটু রেস্ট নিয়ে···

মহীতোষ—না দাদা। আমি রেস্ট নিতে আসি নি। মিলিটারী মানুষ রেস্ট পছন্দ করে না। সুমিতা আমাকে হ্যাণ্ডনোটটা একবার দেখতে দিক।

সুমিতা—দেখে কী করবেন, কাকা? কী দরকার?

চেঁচিয়ে ওঠেন মহীতোষ। ছিঁড়ে ফেলে দেব ওই হ্যাণ্ডনোট, তাতে তোর কী? সেদিনের মেয়ে, একেবারে ডিটেকটিভ পুলিস

অফিসারের ভাষায় কাকাকে জেরা করছেন আর সন্দেহ করছেন! খুব উন্নতি হয়েছে মেয়ের!

সুমিতা—হ্যাণ্ডনোট আপনার দেখে দরকার নেই, কাকা।

মহীতোষ—তামাদি হয়ে গিয়েছে ওই হ্যাণ্ডনোট। ওটা এখন বাজে কাগজের একটা টুকরো মাত্র।

সুমিতা—তামাদি হয় নি। আরও দুটি মাস বাকি আছে।

—অ্যাঁ? চমকে উঠে মহীতোষের চোখেব শাণিত দৃষ্টি। কী করতে চাস তুই?

সুমিতা—এক মাসের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দিন।

মহীতোষ—দেব না।

সুমিতা—তা হলে মামলা হবে।

—কী? কী বললি? মামলা করবি? কী অধঃপতন! হেমন্তদার মেয়ে, চারুবউদির মত মাটির মানুষের মেয়ে, এ কী কদর্য ডাকাতের চরিত্র পেয়েছে! আপনি এই মেয়ের সম্পর্কে একটু সাবধান হোন, একটু কড়া হতে শিখুন, হেমন্তদা।

হেমন্তবাবু—না, মহীতোষ। সুমিতাকে তুমি যা ভাবছো, ও তা মোটেই নয়। তুমি ভুল বুঝেছ।

মহীতোষ—তা হলে বলুন মেয়েকে, এখ্খুনি হ্যাণ্ডনোটটা আমাকে দিয়ে দিতে বলুন!

হেমন্তবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ, ফেরত দেবে বৈকি! নিশ্চয় ফেরত দেবে।

সুমিতা—না বাবা, ফেরত দেব না।

মহীতোষ—দেখুন হেমন্তদা, শুনলেন তো! কাকাকে কী রকম সন্দেহ করে কথা বলছে আপনার মেয়ে! অথচ···অথচ···

হঠাৎ মহীতোষের গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। দুই চোখ ছল-ছল করে। জোরে একটা শ্বাস ছেড়ে আর ঢোঁক গিলে নিয়ে কথা বলেন মহীতোষ।—অথচ এই মেয়েরই বিয়ের খরচের সব দায় একদিন আমাকেই নিতে হবে। দশ হাজার টাকার কমে বিয়ের খরচ

পোষাবে না। এই চিন্তাতে ঘুম হয় না যার, তাকেই আজ সন্দেহ করে শক্ত শক্ত বাজে কথা বলছে সেই মেয়ে! ভগবানও তামাশা করতে জানেন!

হেমন্তবাবু ডাকেন—সুমি!

সুমিতা বলে—টাকাটা আজই দিয়ে দিন না কেন মহীকাকা! আমিও তাহলে এখ্খুনি হ্যাণ্ডনোটটা ফেরত দিতে পারি!

অনেকক্ষণ সুমিতার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন মহীতোষ। তারপর বলেন—আমি এখন নগদ নগদ হাতে হাতে একান্ন টাকা দিচ্ছি। হ্যাণ্ডনোটটা আমাকে দিয়ে দে, সুমি।

সুমিতা—তিন হাজার টাকা দিন। তার একটি পয়সাও কম নয়। তবে হ্যাণ্ডনোট ফেরত পাবেন।

মহীতোষ—অসম্ভব।

সুমিতা—তাহলে মামলা হবে।

মহীতোষ—তাহলে মামলা কর।

টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে বারান্দা থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন মহীতোষ। কিন্তু পলাশতলা পর্যন্ত গিয়েই থামলেন। তারপর হন্ হন্ করে হেঁটে হেঁটে ফিরে এলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন—তিন হাজারই দিচ্ছি। হ্যাণ্ডনোট কই?

কোটের পকেটের ভিতর থেকে নোটের তাড়া বের করলেন মহীতোষ। বাড়ির পাশের বেড়ার ওদিকে ছোট্ট একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় সুমিতা।—রঘু, ও রঘুনাথ!

—যাই দিদি। সাড়া দেয় রঘু, মস্তবড় একটা গরুর শিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে রঘু।

ভ্রূকুটি করে আর রুষ্ট স্বরে প্রশ্ন করেন মহীতোষ।—রঘু আবার কে? এখানে রঘুর দরকারই বা কী?

সুমিতা—রঘু বলতে পারবে, নোটগুলো খাঁটি কিনা।

—এত সন্দেহ! চিৎকার করে আবার একটা লাফ দিয়ে

বারান্দা থেকে নেমে পড়েন মহীতোষ। আবার পলাশতলা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ান। আবার ফিরে আসেন—নাও টাকা।

এসে পড়ে রঘুনাথও। মহীতোষের হাত থেকে নোটগুলি হাতে নিয়ে আর ভাল করে দেখে দেখে গুনতে থাকে রঘুনাথ। হ্যাঁ, পুরো তিনটি হাজার টাকা, এক টাকাও কম নেই। আর ঘরের ভিতরে গিয়ে বাক্সের ভিতর থেকে হ্যাণ্ডনোটটা তুলে নিয়ে এসে মহীতোষের হাতে তুলে দেয় সুমিতা।

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে কথা বলে মহীতোষ।—অনেক রকমের অদ্ভুত স্বভাবের মেয়ে দেখেছি, কিন্তু তোমার মত···ছিঃ, একেবারে জঘন্য!

চলে গেলেন মহীকাকা।

হেমন্তবাবু বলেন—আমার ভাল লাগছে না, সুমি।

সুমিতা—আমার ভাল লাগছে।

চার

অলকার বাবা পার্বতীবাবু একটু আশ্চর্য হয়ে কথা বলেন। বেড়াবার এত জায়গা থাকতে ওঁরা ওদিকে বেড়াতে গেলেন কেন?

অলকার মা—কোন্ দিকে ?

—ওই যে, ওদিকে। হাত তুলে অনেক দূরের সুমিতাদের বাড়ির পলাশ গাছটাকে দেখিয়ে দেন পার্বতীবাবু।

রঘুর মা এসে যদি খবরটা না দিত, তবে বোধহয় কোনদিনই জানতে পেতেন না পার্বতীবাবু, ওঁরা সত্যিই হেমন্তবাবুর বাড়ির বারান্দাতে বসে হেমন্তবাবুর সঙ্গে একঘণ্টা ধরে গল্প করেছেন।

খবর শুনে একটু চিন্তিত হবারই কথা। হেমন্তবাবুর সঙ্গে এঁদের, এই যাঁরা তিনজন ভাগলপুর থেকে এসে পার্বতীবাবুর বাড়িতে উঠেছেন, তাঁদের সঙ্গে হেমন্তবাবুর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বলে কখনও শোনেন নি পার্বতীবাবু। অলকাকে দেখতে এসেছেন এঁরা। যে পাত্রের সঙ্গে অলকার বিয়ের কথা অনেক চিঠি লেখালিখির পর একরকম পাকা হয়েই গিয়েছে, তারই বাবা দাদা আর বন্ধু এসেছেন। অলকাকে ওঁরা একবার দেখবেন, তারপর বিয়ের দিন স্থির করে চলে যাবেন। অসুবিধে না থাকলে আশীর্বাদও করে যেতে পারেন।

আজ সকালবেলা ওঁরা এসেছেন। দুপুর হবার আগেই অলকাকে দেখেছেন। দেখে পছন্দ হয়েছে। সন্ধ্যার ট্রেনে ভাগলপুর ফিরে যাবার জন্য ওঁরা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। বাইরে বেড়াতে যাবার কোন ইচ্ছে ওঁদের ছিল না। ওঁরা একেবারে অলস হয়ে বাইরের বারান্দার আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে এ বছরের বন্যার কথা আলোচনা করছিলেন। কিন্তু বিকেল হবার পরেই ওঁরা কেমন যেন

উস্‌খুস্‌ করে করে শেষে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—পার্বতীবাবু, আমরা একটু ঘুরে আসি। বলতে বলতে ওঁরা বেড়াতে বের হয়ে গেলেন।

অলকার মা—স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজল, তারপর সুমিতা তোমার বাড়ির সামনের এই পথ ধরে হেঁটে হেঁটে চলে গেল, তার পরেই দেখলাম, ভাগলপুরের ভদ্রলোকেরা উস্‌খুস্‌ করছেন। তারপর বেড়াতে বের হয়ে গেলেন। এরকম করবার কী যে মানে হয়, সেটা ওঁরাই জানেন।

পার্বতীবাবু—তাহলে খোঁজ করে একটু জানতে হয়!

—একদিন জানতেই পারবে!

—আমার যে আজই জানা দরকার। দেরি করলে চলবে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এরই মধ্যে ছোট মানুষের ছোট মতলবের একটা বড় চক্রান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

—ছোট মানুষ? কে?

—ওই···ওই ওরা।

—ভাগলপুরের ভদ্রলোকেরা?

—না না, ওঁরা নন। ওঁরা যথেষ্ট ভদ্রলোক। আমার সন্দেহ হয়, ওই ওরা।

—সুমিতারা?

—হ্যাঁ, সুমিতার বাপ হেমন্তবাবু এই চক্রান্তের ব্যাপারে আছে।

—তোমার এরকম সন্দেহ কেন হলো?

—এরকম সন্দেহ হওয়া উচিত, তাই হলো।

—আমার তো অন্য রকমের সন্দেহ হয়।

—কী?

—সুমিতাকে দেখে ভদ্রলোকদের মনে হয়েছে, এই মেয়ে তাঁদের ছেলের বউ হলে আরও ভাল হয়।

—কেন ওঁদের এরকম মনে হবে?

—সুমিতা দেখতে ভাল। অলকার চেয়ে তিন গুণ চার গুণ ভাল।

—বাঃ, খুব চমৎকার মনোবৃত্তি!

—কার মনোবৃত্তি?

—ওই ওদের।

ছটফট করেন পার্বতীবাবু। নিদারুণ একটা সন্দেহ তাঁর মনের শান্তি নষ্ট করে দিয়ে যেন দাপাদাপি করছে। ভাগলপুরের ভদ্রলোকেদের আকস্মিক আচরণের কাণ্ড দেখে তাঁর মনে কিন্তু কোন উষ্মা তপ্ত হয়ে ওঠে না। তিনি মনে করেন, সব দোষ সুমিতা নামে ওই মেয়ের, ষাট টাকা মাইনের একটা চাকরী করে যে মেয়ে।

কিন্তু…সন্দেহ সহ্য করতে গিয়ে পার্বতীবাবুর মনের সব ভাবনার জোর যেন ক্লান্ত হয়ে আসতে থাকে। সন্ধ্যার ট্রেন তো দশ মিনিট পরেই চলে যাবে। কী ভেবেছেন, কিসের দরকারে হেমন্তবাবুর বাড়ির বারান্দাতে বসে সন্ধ্যাটা পার করে দিচ্ছেন ভাগলপুরের ভদ্রলোকেরা?

না, সর্বনাশ যা হবার তা এতক্ষণে হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। হেমন্তবাবু ও তাঁর মেয়ে সুমিতা কি ভাগলপুরের ইচ্ছের প্রস্তাব শুনে ক্ষুধার ভিখারীর মত লুব্ধ হয়ে লাফিয়ে উঠবে না? ওদের কাছে এটা তো হাতে চাঁদ পাওয়ার মত একটা সৌভাগ্যের প্রস্তাব। কোন সন্দেহ নেই, ভাগলপুরের অবিনাশবাবুর মত মানুষ, যাঁর টাকা-পয়সার বিপুল অঙ্কের কাছে দশ-বিশ ভরির গয়না আর পাঁচ হাজার টাকার দান-সামগ্রীর দামটা তুচ্ছ একটা অঙ্কের আঁচড় মাত্র, তিনি তাঁর ছেলের জন্য রূপসী পাত্রী পাওয়ার গরজে বিয়ের সব খরচের দায় স্বীকার করে নিয়ে হেমন্তবাবুকে কন্যাদায়ের দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করে দেবেন।

আরও একটি ঘণ্টা এইভাবে দুঃসহ সন্দেহের এক-একটা দংশন সহ্য করে করে পার্বতীবাবুর মনের শেষ আশার জোরটুকুও যখন

ফুরিয়ে আসে, তখন ফিরে এলেন অবিনাশবাবুরা। কী আশ্চর্য, কোন কথা বলছেন না অবিনাশবাবুরা। তাঁরা শুধু নীরবে হাসছেন। দু'তিন মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তিন ভদ্রলোক প্রায় একসঙ্গে হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গী করে বিদায় নিলেন। অবিনাশবাবু শুধু একটি কথা বললেন—আমরা তবে আসি এখন!

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে আর ব্যাকুল হয়ে কাছে এগিয়ে আসেন পার্বতীবাবু—আসুন আসুন! আশা করছি, আপনাদের দয়ার চিঠি শিগ্‌গীরই পাব।

অবিনাশবাবু—নিশ্চয় পাবেন।

ভাগলপুরের ভদ্রলোকেরা চলে গেলেন। অলকার মামা নিতুবাবু অবিনাশবাবুর হাতের ব্যাগটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

অবিনাশবাবু যেন নিজের মনের সঙ্গে বিড় বিড় করে কথা বলেন—ওরকম করে ব্যাগ বয়েও নিতু ওদের মন গলাতে পারবে বলে মনে হয় না। ওদের মনের আসল খবরের ছিটেফোঁটাও বের করতে পারবে না।

অলকার মা—তবে আমিই যাই!

—কোথায়?

অলকার মা—হেমন্তবাবুকে, না হয় সুমিতাকেই স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করে জেনে আসি, কী ব্যাপার? কেন অবিনাশবাবু ওদের বাড়িতে এলেন, আর কী কথাই বা বলে গেলেন!

পলাশতলা পার হয়ে হেমন্তবাবুর বাড়ির বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতেই চমকে উঠলেন অলকার মা। হাসির শব্দ। বারান্দার মেঝের উপর বসে, কারা যেন হাসির খেলা খেলছে। ঠিকই, মেঝের উপর ছড়ানো চাঁদের আলোর মধ্যে ছক পেতে লুডো খেলছে সুমিতা, রাণু আর ভানু।

—সুমিতা!

ডাক শুনেই সাড়া দেয়, মুখ তুলে অলকার মা'র মুখের দিকে তাকায়।—মাসিমা, আপনি ?

—হ্যাঁ গো মেয়ে। তোমাদের হাসি শুনেই সব বুঝতে পেরেছি। ভাল, ভাল। ভদ্রলোকেরা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়ে আর খুশি হয়ে চলে গিয়েছেন ?

সুমিতা—আপনি কিন্তু আন্দাজে খুশি হয়েছেন, মাসিমা।

—কী বললে ?

সুমিতা—আপনি বোধহয় জানতে চান, ভদ্রলোকেরা কী কথা বলতে এখানে এসেছিলেন, আর আমরাই বা কী কথা বললাম !

—অ্যাঁ ? হ্যাঁ…না, ঠিক তা নয়।

সুমিতা হাসে—হ্যাঁ, মাসিমা। আপনি ঠিক এই কথাই জানতে চান।

—ওঁদের তোমরা চেনো নাকি ?

সুমিতা—না।

—ওঁরা তোমাদের চেনেন নাকি ?

সুমিতা—না।

—ওঁরা বোধহয় তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছেন !

সুমিতা—কথাবার্তা শুনে তাই তো মনে হলো।

—তোমার কী মনে হলো ?

সুমিতা—কিচ্ছু না।

—তার মানে ?

সুমিতা—তার মানে, ঘরের ভিতরে এসে বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করতেই বলে দিলাম, না, তোমার বড়মেয়ে কোনদিনও বিয়ে করবে না।

—সত্যি বলছো ? তুমি একথা স্পষ্ট করে বলে দিতে পারলে ?

সুমিতা—হ্যাঁ।

—ভদ্রলোকেরা কী বললেন ?

সুমিতা—আমার অনেক প্রশংসা করলেন। অলকা এখন কী করছে, মাসিমা ?

—গল্পের বই পড়ছে, আর, কে জানে কেন, রাগ করে বিড় বিড় করছে।

সুমিতা—আপনি ওকে বলবেন, রাগ-টাগ বন্ধ করে এখুনি এক পেয়ালা গরম চা খেয়ে নিক।

—সত্যি, চা যেন মেয়েটার প্রাণ। আমি বলি, একদিন বিপদে পড়বি তুই। ভাগলপুরের অবিনাশবাবুদের বাড়িতে চা একেবারে অচল। সেখানে কি চা-চা করে মানুষগুলিকে ব্যস্ত-বিরক্ত করবি ?

সুমিতা—অলকা কবে যাচ্ছে ভাগলপুরে ?

—দিনক্ষণ যদিও একেবারে ঠিক হয়ে যায় নি, তবু মাঘে না হোক ফাল্গুনে কোন একটি ভাল দিনে বিয়েটা হয়ে যাবেই যাবে, যদি অবশ্য কারও হিংসের চক্রান্তে বিয়ে ভেঙে না যায়।

অলকার মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে, মায়াকরুণ একটি অদ্ভুত শান্ত দৃষ্টি তুলে সুমিতা যেন সান্ত্বনার কথা বলে—বিয়ে হবেই, মাসিমা। কারও চক্রান্তে এ বিয়ে ভেঙে যাবে না।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। সুমিতার পিঠে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে অলকার মা'র খুশি মূর্তিটা চলে গেল।

বাড়ি ফিরে অলকার কাছে এসে অলকার মা'র সেই খুশি মূর্তিটা চেঁচিয়ে ওঠে।—সব ভাল যার শেষ ভাল। ফাঁড়া কেটে গেছে।

পার্বতীবাবু ছুটে আসেন—অ্যাঁ, কী হলো ?

অলকার মা—ভাগ্যিস সুমিতা মেয়েটার মনে এরকম অদ্ভুত একটা অহঙ্কারপনা ছিল ! ভাগ্যিস ওদের মনে রোগ ছিল !

পার্বতীবাবু—কাদের কথা বলছো ?

—সুমিতাদের কথা বলছি। অবিনাশবাবুর কথাতে সাড়া দেয় নি সুমিতা।

পার্বতীবাবু—তার মানে ?

—হেমন্তবাবু ভাগলপুরের ভদ্রলোকদের জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মেয়ে বিয়ে করবে না।

পার্বতীবাবু—ভাল, ভাল। নিশ্চয় একটা ভাল কারণ আছে।

—ভগবান জানেন। কিন্তু আমিও ভাবছি, ওই মেয়ের মনে এত অহঙ্কার এল কোথা থেকে? দু'বেলা পেট ভরে ভাত খাওয়ার ভাগ্যি নেই, অথচ অবিনাশবাবুর মত বড়মানুষের ছেলের বউ হবার ভাগ্যিটাকে এককথায় ভাগিয়ে দিল। আশ্চর্য!

দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে, অলকার মা'র কথাগুলিকে শুনে শুনে অলকার রঙীন মুখটা হঠাৎ যেন সাদা হয়ে যায়। অলকার ভাগ্যটাকে দয়া করেছে কিনা, আর কেউ নেই, ওই সুমিতা। একটুও অভিমানের কথা নয়, কী অদ্ভুত একটা কঠিন অহঙ্কারের কথা বলেছে সুমিতা। বিয়ে করবে না, ভাগলপুরের অবিনাশবাবুর মত বড়মানুষের অত রূপের গুণের ছেলেকেও বিয়ে করবে না সুমিতা।

এক এক করে বীরবাঁধের আরও কত সকাল ও বিকেল পার হয়ে গেল। দেখতে পেয়েছে অলকা, সুমিতা এই পথ ধরেই আসছে আর চলে যাচ্ছে, বাড়ির দিক থেকে স্কুলের দিকে, আবার স্কুলের দিক থেকে বাড়ির দিকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সরে গিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে অলকা। সুমিতা যেন অলকাকে দেখতে না পায়। দেখা হলেই তো হেসে ফেলবে সুমিতা, সুমিতার দয়ালু অহঙ্কারের হাসি।

অলকার লুকিয়ে পড়া সতর্ক মুখটা দেখতে পায় না সুমিতা। সুমিতার সেই আনমনা মূর্তিটা পথ হেঁটে অলকাদের বাড়ির কাছে এসেও চোখ তুলে একবার তাকায় না। দেখতে চেষ্টা করে না যে, অলকাদের বাড়ির বারান্দার টবে অনেক ডালিয়া ফুটেছে।

কিন্তু বাড়িতে এসে হেমন্তবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সুমিতা।—না বাবা, ওঁরা লোক ভাল নন। ওঁরা ভাল লোক হতেই পারেন না।

হেমন্তবাবু—মিথ্যে নিন্দে করিস না, সুমি। ওঁরা যে তোকে পছন্দ করেছিলেন, সেটা ওঁদের কোন দোষ নয়।

সুমিতা—দোষ বৈকি!

—কেন?

সুমিতা—ওঁরা সোনার পাল্‌কি নিয়ে গরীবের বাড়ির মেয়ে চুরি করতে এসেছিলেন।

—ভুল, খুব ভুল ধারণা করেছিস। বেশি বই পড়ে তুই বেশি বাড়িয়ে কথা বলতে শিখেছিস, সুমি।

—এক ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে মেয়ে দেখে ও তাকে পছন্দ করবার পর যাঁরা আবার অন্য মেয়ের খোঁজ নিতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তাঁরা ভাল লোক হতেই পারেন না।

—এটা একটা কথা বটে।

সুমিতা এইবার হেমন্তবাবুর কাছে এসে তাঁর পক্ষাঘাতের হাতটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা মেয়েটির মত আদুরে বিহ্বলতার হাসি হাসতে থাকে।

—পরের বাড়িতে আমি যাব কেন? কখ্‌খনো যাব না।

—আমার এই রোগটা যখন সেরে যাবে, আমি আবার কারবারের কাজটা ধরে ফেলতে পারবো, তখন তো যাবি?

সুমিতা—না বাবা। তখনও যাব না। যাবার দরকার নেই। যাবার কোন গরজ নেই আমার।

—কেন রে?

সুমিতা—আমার ভাল লাগবে না।

—তবে কি এমনই করে চিরটাকাল শুধু চাকরি করে···

সুমিতা—হ্যাঁ, আমি এখানেই তোমার কাছে পড়ে থাকবো।

হেসে ফেলেন হেমন্তবাবু, খুবই করুণ হাসি।—এমনই করে রাণু আর ভানুর সঙ্গে লুডো খেলে জীবনটাকে···

সুমিতা—হ্যাঁ, এই তো ভাল। এর চেয়ে বেশি সুখের জীবন

যদি কোথাও থাকে তো থাকুক, আমি চাই না, আমার দরকার নেই।

রাত হয়েছে। এখন আর লুডো খেলবার কোন ব্যস্ততা আর হাসাহাসি নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে রাণু আর ভানু। হেমন্তবাবুর তন্দ্রালু কণ্ঠস্বরের স্তোত্রপাঠের ভাঙা ভাঙা ভাষার শব্দগুলিও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। বীরবাঁধের আকাশে জ্যোৎস্নার জোয়ার। মৃদু বাতাসের ছোঁয়া লেগে পলাশের মাথার পাতা সির সির করে কাঁপে।

ইচ্ছে করলে এখুনি ঘুমিয়ে পড়তে পারে সুমিতা। কিন্তু চুপ করে বসে বীরবাঁধের আকাশের জ্যোৎস্নার জোয়ারে ছোট ছোট সাদা মেঘের ভেলাগুলিকে দেখতেও ইচ্ছে করে। সুমিতার মনের মধ্যে কোন অশান্ত ভাবনার সামান্য উৎপাতও নেই। বুঝতে পারে না সুমিতা, মণিকার মা তরুজেঠিমা সুমিতার সঙ্গে দেখা হলে কেন এত বেশি দুঃখ করে কথা বলেন? বেশ তো আছি, এভাবে চিরটা কাল বেশ থাকতে পারলেই হলো। তরুজেঠিমা হয়তো ভেবেছেন যে, হেমন্তবাবুর মেয়েটা বোধহয় টাকা-পয়সার অভাবের দুঃখ সহ্য করতে গিয়ে দিন-রাত কাঁদে। কেন যে ওঁদের মনে এরকম সন্দেহ হয়, বুঝতে পারে না সুমিতা। ইচ্ছে করে, তরুজেঠিমাকে একটু বেশি স্পষ্ট করে আর হেসে হেসে বলে দিলে হয়, চাকরি করে রান্না-বান্না করে আর কয়লা ভেঙেও সুমিতার প্রাণে অনেক আনন্দ আছে। কেউ যদি বলে, এটা একটু অদ্ভুত বেমানান অহঙ্কার, তবে বলুক। কেউ যদি বলে, এটা হেমন্তবাবুর মেয়ের মনের রোগ, তবে তাই বলুক।

শুনতে পেয়েছে সুমিতা, রঘুর মা একদিন এসে বলে গিয়েছে, শ্যামবাবুব বাড়ির পিসিমা একদিন খুব বিশ্রী একটা নিন্দের কথা বলেছেন—হেমন্তবাবুর মেয়ে সুমিতার শরীরেই রোগ আছে, নইলে অবিনাশবাবুর ছেলের মত চমৎকার রূপ-গুণের ছেলেকে বিয়ে করতে কোন ইচ্ছে হয় না কেন এই মেয়ের?

বাতাসের যেমন কান আছে, তেমনই মুখও আছে নিশ্চয়।

নইলে বীরবাঁধের নানা মুনির নানা মন্তব্যের কথাগুলি সুমিতা শুনতে পায় কেমন করে ?

কে যেন বলেছেন, এই মেয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে আর লাঠি হাতে নিয়ে ফৌজদারী করতে পারে। কেউ বা বলেন, শুধু চেহারাটাই নরম, কিন্তু স্বভাবটা যেমন রুক্ষ, তেমনই শক্ত। হরনাথ বলেছেন, সুমিতা তুকতাক শিখেছে। অমাবস্যার দিনে একলা ভাসানি নদীর ধারে শ্মশানডাঙাতে গিয়ে চিতের ছাই নিয়ে আসে। জনার্দনের জেঠতুতো দাদা শর্বরীকান্ত বলেছেন, পর পর তিনদিন ডাকঘরে গিয়ে সুমিতাকে তিনি চিঠি ফেলতে দেখেছেন। কার কাছে, কেন, আর কিসের এত চিঠি লিখছে সুমিতা, যদি কারও সঙ্গে একটা ইয়ে হয়ে না থাকে ?

সব কথা শুনে হেসে ফেলতে পেরেছে সুমিতা। কিন্তু ভাবতে গিয়ে একটু আশ্চর্যও হতে হয়েছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, এটা কী শুধু এই বীরবাঁধের স্বভাব, না এই পৃথিবীরই স্বভাব ? গল্প শোনা যায়, জঙ্গলের খরগোশ ছুটতে গিয়ে যখন মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, কাঁটা ও পাথরের ঘষা লেগে রক্তমাখা খরগোশ যখন ছটফট করতে থাকে, তখন চারদিক থেকে অনেক খরগোশ এসে তার কানের উপর থাবার খোঁচা দিয়ে দিয়ে চলে যায়। সুমিতার ভাগ্যটাও যেন একটা আহত রক্তমাখা খরগোশ। সবাই যেন খোঁচা দিয়ে আনন্দ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। শুধু ওই এক প্রিয় জেঠামশাই ছাড়া এই বীরবাঁধের কোন মানুষ সুমিতাকে দেখে খুশির হাসি হাসে না। কেউ জিজ্ঞাসা করে না, সুমিতা, তোমরা সবাই ভাল আছ তো ?

এইরকম একটি অদ্ভুত স্বভাবের বীরবাঁধে, অদ্ভুত স্বভাবের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে সুমিতার মত মেয়ের জীবনটাকে বেশ সাবধানে আর অনেক হিসেব করে চলতে হবে। উপকারের চমৎকার কথাগুলিকে একটুও বিশ্বাস করা উচিত নয়, অপকারের চেষ্টাগুলিকে একটুও ভয় করা উচিত নয়।

পাঁচ

বীরবাঁধের মত ছোট জনপদের জীবনে ঘটনার চমক খুব বেশি না হলেও, আছে। পার্বতীবাবুর মেয়ে অলকার বিয়ে যেদিন হয়ে গেল, সেদিন বীরবাঁধের বাতাসটা লুচিভাজা ঘিয়ের গন্ধে ভরে গিয়েছিল। আর কেউ নয়, শুধু এক প্রিয়নাথবাবু লক্ষ্য করেছিলেন, অলকার বিয়ের নেমন্তন্নে বীরবাঁধের সব বাঙালী বাড়ির সব মানুষ এসেছিল, কিন্তু আসে নি হেমন্তবাবুর বাড়ির কেউ। সুমিতা নয়, রাণু আর ভানুও নয়।

হেমন্তবাবুর বাড়ির মানুষগুলিকে কি নেমন্তন্ন করাই হয় নি? বলাইকে জিজ্ঞেসা করে জানতে পেরেছেন প্রিয়নাথবাবু, নেমন্তন্ন করাই হয় নি।

কী আশ্চর্য, সেই হরনাথ, জোচ্চোরের ছলনা যাঁর অনেক আশার ভাগ্যটাকে একেবারে ধুলো করে দিয়ে সরে পড়েছে, তিনি এই ছ'মাসের মধ্যেই আবার নতুন আশায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। হরনাথ খুব ব্যস্ত। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, হরনাথ সারাদিনের মধ্যে দু'বার না হোক অন্তত একবার সুমিতার বাবা হেমন্তবাবুর কাছে গিয়ে হাসছেন আর গল্প করছেন।

শুনেছে সুমিতা, কিসের গল্প করছেন অঞ্জলির বাবা হরনাথবাবু। হরনাথবাবু আবার সুমিতার জীবনের একটা বড় উপকার করতে চান। নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, সুখী হবে সুমিতা; আর হেমন্তবাবুর অভাবের জীবনটাও টাকা-পয়সার অনেক সাহায্য পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে; এইরকম একটি উপকারের প্রস্তাব নিয়ে আনাগোনা করছেন হরনাথবাবু।

জনার্দনের জেঠতুতো দাদা, বিপত্নীক শর্বরীকান্তের সঙ্গে যদি

সুমিতার বিয়ে হয়, তবে লোকে শুধু এইটুকু মাত্র মন্তব্য করবে যে, পাত্রের বয়সটা বেশি আর মেয়ের বয়সটা বেশি নয়। কিন্তু ওরা হিংসেও করবে, হেমন্তবাবু ও সুমিতার সৌভাগ্য দেখে ওরা ভয়ানক হিংসে করবে। রাজরাণীও পায় না, সেইরকম সম্পত্তি-সুখ পেয়ে যাবে সুমিতা।

হরনাথবাবু বলেন—শর্বরীকান্তের জন্য আমার মনে শ্রদ্ধা আছে বটে, কিন্তু শুধু সেই জন্যে নয়, সুমিতার জন্য আমার প্রাণের মায়াই আমাকে টানছে। তাই বার বার আসি।

হেমন্তবাবু শুকনো স্বরে শুকনো হাসি হাসেন। চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে যেন ভয় পেয়ে চমকেও ওঠে।—হ্যাঁ, ভাল কথা বটে, মন্দ কথা নয়।

—আমি শর্বরীকান্তের দালাল নই হেমন্তবাবু। শর্বরীকান্ত আমাকে কমিশন দেবে না। আমি এটা আমার একটা কর্তব্য বলে বুঝেছি বলেই উদ্যোগী হয়েছি। এই শ্রাবণেই অনেকগুলি শুভদিন আছে, হেমন্তবাবু।

পাশের ঘরে বসে অঞ্জলির বাবার কর্তব্যবোধের কণ্ঠস্বর শুনে সামান্য একটু ভ্রূকুটিও করে না সুমিতা, একটুও উদ্বিগ্ন হয় না। মনে পড়ে, প্রিয় জেঠামশাই সেদিন ওর জেঠিমাকে যে কথাটা বলছিলেন। —শর্বরীকান্ত হঠাৎ হরনাথবাবুকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়ে বসলেন কেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। শর্বরীকান্তকে আমি যেটুকু চিনি তাতে বুঝেছি যে, কাউকে টাকা ধার দেবার মানুষ নয় শর্বরীকান্ত।

যেদিন খুব বেশি উৎসাহিত ও উল্লসিত হয়ে ডেকে ফেললেন হরনাথ, সুমিতা, তুমি কোথায়? একবার এদিকে এস দেখি! কথাটা শুনে যাও। সেদিন উঠে গিয়ে হেমন্তবাবুর চেয়ারের একটা হাতল ধরে হরনাথের মুখের দিকে তাকায় সুমিতা।—বলুন!

হরনাথ—আমি শর্বরীকান্তের বন্ধুমানুষ নই সুমিতা, আমি

তোমাদেরই সংসারের একজন বন্ধুমানুষ, যদিও ভগবান আমাকে এমন টাকা দেন নি যে, টাকা দিয়ে তোমাদের সংসারের কোন বন্ধুত্ব আমি করতে পারি।

সুমিতা হেসে ফেলে—কিন্তু শর্বরীবাবু তো আপনার বন্ধুমানুষ!

হরনাথ—শর্বরীকান্ত আমার কী ছাই বন্ধুত্ব করবে?

সুমিতা—আপনাকে টাকা ধার দিতে পারে।

হরনাথ— অ্যাঁ? কী বললে?

সুমিতা—আমি বলছি না, আপনি শর্বরীবাবুর কাছ থেকে কমিশন আদায় করেছেন। বলছি, ধারই পেয়েছেন।

চেয়ার ছেড়ে একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হরনাথবাবু। অদ্ভুত একটা ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর সারা মুখটাও কুঁচকে গিয়ে কুৎসিত হয়ে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই পলাশতলা পার হয়ে সড়কের উড়ন্ত ধুলোর মধ্যে যেন গা-ঢাকা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।

তিনটি মাসও পার হয় নি, শর্বরীকান্ত যেদিন হরনাথবাবুর কাছে ধারের টাকা দাবি করে নোটিস দিলেন, সেদিন বিকালে হরনাথের উদ্বিগ্ন মূর্তিটা সুমিতাদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে, মুখের উপর চাদরের খুঁট চেপে রেখে, আর কেঁপে কেঁপে ও ছুটে ছুটে শর্বরীকান্তের বাড়ির দিকে চলে গেল। সেদিনই সন্ধ্যায় রঘুর মা এসে সুমিতার কাছে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে। শর্বরীবাবুর পা জড়িয়ে ধরেছেন হরনাথবাবু। কিন্তু শর্বরীবাবু বলছেন, এতে হবে না, আমার টাকা ফেরত দিন। নয়তো আপনার বাড়ির সব ফার্নিচার বেচে দিয়ে দেনা শোধ করুন।

চলে গেল রঘুর মা। চেঁচিয়ে ডাকছে রঘু—ও মা, শিগ্‌গীর এস। তোমার আদুরে গরু আমার আদর মানছে না, গুঁতোচ্ছে আমাকে।

মাধবপুরের মেজমামা সুমিতার দুই চিঠির কোন চিঠিরই উত্তর দেন নি। কিন্তু তৃতীয় চিঠিটার উত্তর দিয়েছেন।—তুমি কি মামার

বাড়ির স্নেহ যত্ন ও আমাদের সব কথা ভুলে গেলে, সুমিতা? আমাদের কাছে তোমার কি আর কিছু দাবী করবার নেই? একটু আশীর্বাদও না? শুধু টাকার দাবী? তাও মাত্র একটি হাজার টাকার দাবী? চিন্তা করো না, আমি নিজেই একদিন বীরবাঁধে গিয়ে তোমাদের পাওনার টাকাটা দিয়ে আসব। আমি জানি, চারুদির কাছে লেখা একটা চিঠিতে আমি লিখেছিলাম যে, তুমি সোনা কিনতে আমাকে যে একহাজার টাকা দিয়েছ, সেটা আমি খরচ করে ফেলেছি।

মাধবপুরের মেজমামার চিঠিতে বেশ শক্ত ভাষায় কয়েকটা ধিক্কারও আছে। 'তুমি আসানসোলে আমাদের অফিসের ম্যানেজারের কাছে সেই চিঠির কপি কেন পাঠালে? তোমার ভদ্রতায় একটুও বাধলো না? ম্যানেজারের কাছে চুগলি করা মানে আমার ক্ষতি করা। চারুদিদির মেয়ে হয়ে তুমি এরকম একটা কাণ্ড করতে পার, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।'

মেজমামার চিঠির জবাব দিয়েছে সুমিতা—কবে টাকা পাঠাবেন সেটা আপনি স্পষ্ট করে লেখেন নি। আপনি একমাসের মধ্যে টাকাটা পাঠিয়ে দিলে আমি ম্যানেজারের কাছে আবার কোন চিঠি দেব না।

হেমন্তবাবু বলেন—এসব তুই কী করছিস, সুমি? আমার ভাল লাগছে না।

সুমিতা—আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগছে।

ধসে পড়ে গিয়েছিল যে-ঘরের দেয়াল আর চালা, সে ঘর সারিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুমিতা। শ্যামবাবুর বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে বের হয়ে, সামনের পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেয়েছে, নতুন কেনা টালিগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গুনছে সুমিতা।

শ্যামবাবুর পুত্রবধূ হেনারাণী ছটফট করে হেসে ওঠে।—সত্যি, নিন্দেটা খুব মিথ্যে নয়। এরকম করে পুরুষের কাজ করতে করতে সত্যিই যে একদিন পুরুষ হয়ে যেতে হবে।

শ্যামবাবুর মেয়ে অপরাজিতা ভুই ভুরু বাঁকিয়ে সুমিতার দিকে তাকায়।

—খোঁপাটাকে কী রকম জবড়জং করে বেঁধেছে, দেখছো বউদি?

—দেখছি বৈকি!

অপরাজিতা—খোঁপা বাঁধবার নিয়মটাও কি ভুলে যেতে বসেছে?

হেনারাণী—আশ্চর্য নয়। ভুলেই গিয়েছে বোধহয়।

অপরাজিতা—আগে কত গান গাইতো, এখন ছেড়েই দিয়েছে।

হেনারাণী—গান গাইতে ভুলেও গিয়েছে বোধহয়।

অপরাজিতা—আগে দেখতাম, সুমিতার কপালে কুমকুমের সুন্দর একটি টিপ রয়েছে।

হেনারাণী—এখন কী থাকে? ভস্মতিলক? হেসে হেসে অপরাজিতার গায়ে একটা ঠেলা দেয় আর চলতে থাকে হেনারাণী।

পলাশতলার কাছে এসে সড়কটা যেন ছ'ফালি হয়ে আর ছটি রাস্তা হয়ে এঁকে-বেঁকে ছ'দিকে চলে গিয়েছে। একটি রাস্তা রেল-কলোনির দিকে, আর একটি পশ্চিমে ঘুরে সুমিতাদের বাড়ির পেঁপে-বাগানের বেড়ার গা ঘেঁষে একবারে সোজা নদী ভাসানির কিনারায় প্রথম ডাঙাটার দিকে। এই ডাঙাতে বেড়াবার মানুষকে টেনে আনবার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো, ডাঙার নরম ঘাস আর ছোট্ট-নরম ঘেসো ফুল। বড়রা এখানে বেড়াতে এসে ক্ষণিক বিরামের জন্য বসে পড়তে গিয়ে একেবারে শুয়েই পড়েন। আর ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে শুধু ঘেসো ফুল কুড়িয়ে পকেটে ভরে।

পেঁপে-বাগানের বেড়ার পাশে রাস্তার উপর মহাবীরের পানের দোকানে খদ্দেরের ভিড় প্রায় সব'সময়ই থাকে। চকিত হাসির শব্দ শুনে মহাবীরের দোকানের দিকে তাকায় সুমিতা। প্রায়ই দেখতে পায়, তাই আজ দেখে আশ্চর্য হয় না সুমিতা, শ্যামবাবুর ছেলের বউ হেনারাণী আর মেয়ে অপরাজিতা, দুজনেই হাসাহাসি করে মহাবীরের দোকানের পান কিনে খাচ্ছে। দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

আর অমন ছটফট করে কী জানি কী যেন দেখছে ওরা। বোধহয় পান-চিবানো মুখের দুই ঠোঁটের লাল হাসির সঙ্গে মুখের সব হাসিটা কতটা লাল হলো, তাই ওরা দেখছে আর হাসছে।

যদিও একটু দূরে, যদিও ওদের কথাটার ভাষাটা একটু ক্ষীণ হয়ে বাতাসে ভেসে আসছে, তবু শুনতে পায় সুমিতা, অপরাজিতার গায়ে ঠেলা দিয়ে হেনারাণী বলছে—ঘরের কাজ তো আমিও করি আর তুমিও কর। কিন্তু সেজন্যে হাসপাতালের নার্সের মত কোমরে তোয়ালে জড়াতে হয়েছে কি ?

খিলখিল করে হাসতে থাকে অপরাজিতা। কিন্তু সুমিতার চোখে-মুখে কোন বিরক্তি বা বিস্ময় চমকে ওঠে না, কোমরের তোয়ালেটার দিকেও তাকায় না।

যেমন আগে অনেকবার দেখেছে সুমিতা, তেমনই আজও বাড়ির বারান্দাতে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়; হেনারাণী আর অপজিতার দুই হাস্যমুখী মূর্তি হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে এগিয়ে যেয়ে, রঙীন শাড়িপরানো দুটি ছোট্ট ছবি হয়ে, শেষে ডাঙার নরম ঘাসের উপর শুয়েই পড়ল। হ্যাঁ, ওরা দুজন এরকম করে শুয়ে পড়ে বলেই দেখতে পাওয়া যায়, যখন ওরা বাড়ি ফিরে যাবার জন্য এই রাস্তা ধরে চলে যায়, দুজনেরই খোঁপাতে ঘেসো ফুল ছেয়ে রয়েছে।

রঘুর মা কয়েকবার শ্যামবাবুর ছেলের বউ আর মেয়ের এইরকম মূর্তির দিকে কটমট করে তাকিয়েছে। হেনারাণী বলে—কেমন আছ রঘুর মা ? তোমার সেই গরুটা যেটা ক'মাস আগে সধবা হয়েছিল, সেটা কি বাচ্চা বিইয়েছে ?

রঘুর মা—না, কিন্তু মনে হচ্ছে, কুমারী গরুটা শিগ্গীর বিয়োবে।

হেসে চেঁচিয়ে ওঠে দুজনে, হেনারাণী আর অপরাজিতা।—রেগেছে, রঘুর মা বড্ড রেগেছে !

রাগ চেপে, আর রাগের ভাষাটাকেও চেপে দিয়ে রঘুর মা সরে

যায়, আর বাড়ি ফিরে যাবার পথে সুমিতাদের বাড়িতে এসে চাপা রাগের ভাষাটাকে একেবারে মুক্ত করে দেয়।—আমি বলছি বেটি, শ্যামবাবু খুব শিগ্‌গীর একটা খুব খারাপ বিপদে পড়বেন। বাড়ির মেয়েগুলো যখন-তখন···

সুমিতা—তুমি আমার কাছে এসব কথা কখনো বলবে না, রঘুর মা। শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

রঘুর মা'র রুষ্ট কণ্ঠস্বর তবু গজগজ করে।—ছি, ছি, এরা নাকি মেয়েমানুষ! এরা নাকি ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে!

রঘুর মা চলে যেতেই আবার ঘরের কাজে ব্যস্ত হবার সুযোগ পায় সুমিতা। এই কাজটাই সুমিতার প্রাণের যেন সবচেয়ে বড় তৃপ্তির একটা শিল্পকলা।

বিকেল ফুরিয়েছে। হেনারাণী আর অপরাজিতা এখন কোন্ দিকে আর কতদূরে চলে গিয়ে কী করছে, সে দৃশ্য দেখবার জন্য সুমিতার মনে কোন কৌতূহল নেই। ওসব দৃশ্য, আর ওদের ওইসব কঠিন ঠাট্টার ভাষা, কিংবা, এদিকে-ওদিকে আরও যে-সব সন্দেহ অপবাদ আর অদ্ভুত আক্রোশ বাতাসে উড়ে বেড়ায়, সে-সব যেন বীরবাঁধের শুকনো সড়কের ধুলোর মত বস্তু।

সন্ধ্যা হয়েছে। ঘরের ভিতরে মেঝের উপর মাদুর পেতে আর আলো রেখে দিয়ে ডাক দেয় সুমিতা।—না, আর খেলা করবার সময় নেই, রাণু। শুনছো ভানু, এইবার হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসো।

আজই দু'পয়সা দিয়ে বাজার থেকে লাউয়ের যে ছোট টুকরোটা কিনে নিয়ে এসেছে সুমিতা, সে টুকরোর সবটুকু দিয়ে আজই এখনই ঘণ্ট রেঁধে ফেলবার দরকার নেই। অর্ধেকটা থাকুক। তাছাড়া ঘণ্ট করবারই বা দরকার কি? · বেশ ঝোল রেখে রান্না করাই ভাল। খোসাগুলো দিয়ে একটা ভাজা হতে পারে। পেঁয়াজের ডাল খেতে খুব ভালবাসে ভানুটা। কিন্তু ওই তো, শুধু একটা পেঁয়াজ ডালাতে পড়ে আছে। তাই হবে। শুধু বাবার জন্য দুটো আলুসেদ্ধ। ব্যস্,

তাহলেই হয়ে গেল। কিন্তু খেতে বসলে বাবার মেজাজটা বড় অদ্ভুত হয়ে যায়। সামান্য দুটো আলুসেদ্ধ, কী-ই বা এমন সুস্বাদু বস্তু! কিন্তু সেটুকুও একা খেতে চাইবেন না। চার ভাগ করে নিয়ে তার একটা ভাগ পাতে রাখবেন। বাকি তিনভাগ ছেলে-মেয়ের পাতে তুলে দেবেন।

রান্না শেষ হবার পর যখন কুয়োতলায় গিয়ে কোমরের তোয়ালে-টাকে খুলে নিয়ে কাচতে থাকে সুমিতা, তখন একবার হেসেও ফেলে। কী এমন ভুল কথা বলেছে অপরাজিতা! ঠিকই তো বলেছে। কিন্তু নার্সের কাজটা কি খারাপ কাজ? আমার মত নার্সের কাজ একবার করেই দেখুক না অপরাজিতা; তাহলেই বুঝতে পারবে, কত ভাল লাগে।

কুয়োতলাতে অন্ধকারের মধ্যে বসে কাচাকাচির কাজ শেষ করতে যদি দেরি করে সুমিতা, তবে ভানু পড়ার ঘরের লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিয়ে, ঘরের বাইরে এসে, বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দেয়—দিদি, তোমার ভয় করছে নাকি? লণ্ঠনটা নিয়ে যাব?

হেসে জবাব দেয় সুমিতা—খুব ভয় করছে, কিন্তু লণ্ঠন চাই না।

রাণু ডাক দেয়—আর কতক্ষণ ওখানে বসে কাজ করবে? এস এখন।

সুমিতা—আসছি।

বাড়িতে শুধু একটি লণ্ঠনের আলো জ্বলে। রান্নাঘরে কেরোসিনের একটা কুপি। সেই কুপিটাকে কাছে রেখে সন্ধ্যার কুয়োতলায় কাজ করতে পারে সুমিতা, কিন্তু করে না। ভানু এক-একসময় রাগ করে ফেলে—কেরোসিন বাঁচাবার জন্যে কুয়োতলাতে অন্ধকারে বসে কাজ করছে দিদি, কিন্তু জানে না যে, পেঁপে-বাগানের গর্তের মধ্যে চিতি সাপ আছে। যদি একদিন দিদিকে সাপে কামড়ায়, তবে দিদিকে আমি একবার দেখে নেব।

রাণু—দিদিকে সাপে কামড়ালে তুই দিদিকেই দেখে নিবি! বাঃ, সাপটাকে দেখে নিবি না? সে সাহস নেই বুঝি?

ভানু—সাপটাকে তো মেরে ফেলবই। কিন্তু সাপের কাছে যাবে কেন দিদি?

হাত-মুখ ধুয়ে, কুয়োতলা থেকে ফিরে এসে যখন ঘরের ভিতরে দাঁড়ায় সুমিতা, লণ্ঠনের আলোতে যখন সুমিতার ভিজে দুই কালো ভুরুর জল চিকচিক করে, তখন রাণু হঠাৎ বলে ওঠে—রেল-কলোনির রঙ্গনাথবাবু কী বলেছে, জান?

সুমিতা—না। কী বলেছে? কাকে বলেছে?

রাণু—আমি শুনেছি, প্রিয় জেঠামশাইকে বলছিলেন রঙ্গনাথনবাবু।

সুমিতা—কী?

রাণু—বলছিলেন, বীরবাঁধের সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটিকেই সবচেয়ে বেশি কষ্টের জীবন সহ্য করতে হচ্ছে, এ বড় দুঃখের কথা।

সুমিতা—খুব বাজে কথা বলেছেন।

রাণু—কিন্তু তুমি যে বীরবাঁধের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে, সেটা তো বাজে কথা নয়!

সুমিতা—তুই যে বীরবাঁধের সব মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে কম পড়াশোনা করিস, এটা তো বাজে কথা নয়!

রাণু—আমার পড়তে-টড়তে ইচ্ছেই করে না।

সুমিতা—কী ইচ্ছে করে?

ভানু চেঁচিয়ে বলে ওঠে—ও বলছিল, ওর চাকরি করতে ইচ্ছে করে।

রাণুর গলা জড়িয়ে ধরে সুমিতা—তুই কেন চাকরি করবি? তুই অনেক লেখাপড়া শিখবি। তুই পাটনাতে হোস্টেলে থাকবি, কলেজে পড়বি। তারপর···

রাণু—তারপর চাকরি করবো।

সুমিতা হাসে—না, তারপর শ্বশুরবাড়ি যাবি।

রাণু—কখ্‌খনো না।

ভানু—যেতেই হবে।

রাণু—সাবধান, ভানু!

বিছানা থেকে উঠে এসে মেঝের মাদুরের উপর বসে পড়েন আর হাসতে থাকেন হেমন্তবাবু।—কিসের ঝগড়া? ওরা রাগারাগি করছে কেন, সুমি?

রোজই, এই সময়, খেতে বসবার আগের সময়ের অন্তত একটি ঘণ্টা হেমন্তবাবুর বাড়ির একটি ঘর এইরকমই হাসাহাসি আর রাগারাগির কলরবে ভরে যায়। আর, বাইশ বছর বয়সের মেয়ে সুমিতাও এই সময় হেমন্তবাবুর গা ঘেঁষে বসে পড়ে। আর কেউ না দেখুক, রঘুর মা এক-একদিন এই সময় এসে দেখে ফেলেছে। কিন্তু দেখেও ঠিক বুঝতে পারে নি, এ কোন্‌ মেয়ে অমন আদুরে মায়ার পুতুলের মত ছোট্টটি হয়ে হেমন্তবাবুর গা ঘেঁষে বসে আছে? ডাক দিয়েছে রঘুর মা—তোমার দিদি কোথায়, রাণু? রঘুর মা'র ডাক শুনে আশ্চর্য হয়েছে সুমিতা, বুড়ির চোখের দৃষ্টির জোর কি এরকমই কমে গিয়েছে, এত কাছে দাঁড়িয়েও সুমিতাকে দেখতে পাচ্ছে না?

হ্যাঁ, দেখেও চিনতে পারে নি রঘুর মা। কারণ রঘুর মা-ও বুঝতে পারে নি যে, হেমন্তবাবুর মেয়ে সুমিতার এরকম একটা রূপ থাকতে পারে।

যার মনে আর প্রাণে যত কথা আর যত গল্প সারাদিন ধরে নীরব হয়ে লুকিয়ে থাকে, তার সবই যেন এইসময় মুখর হয়ে উঠতে চায়। হেমন্তবাবু বলেন—আমি যখন প্রথম বীরবাঁধে এসেছিলাম, তখন শালের জঙ্গলটা ছিল আমাদের এই পেঁপে বাগান থেকে মাত্র বিশ হাত দূরে। রাত্রির হরিণ জঙ্গল থেকে বের হয়ে কতবার এই পলাশতলায় ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়তো। ভোর হয়ে গেলেও ঘুমিয়ে পড়ে থাকতো।

ভানু—কেউ গুলি করে মারতো না ?

হেমন্তবাবু—না। যে হরিণ জঙ্গল ছেড়ে লোকের ঘরের উঠানে কিংবা বাগানে হঠাৎ এসে পড়তো, তাকে কেউ মারতো না। শিকারীরা জঙ্গলে গিয়ে হরিণ মারতো, জঙ্গলের বাইরে নয়। পলাশতলার ওদিকে রাস্তার ওধারে একটা মাটির ঘরে এক ভদ্রলোক থাকতেন, তাঁর নাম ফকিরবাবু। হরতকির ব্যবসা করতেন। কিন্তু সে এক অদ্ভুত ব্যবসা। পাঁচ-সাত বছর আগে যোগাড় করা এক বস্তা হরতকি শুকিয়ে পাকিয়ে তাঁর ঘরের ভিতরে জঞ্জালের মত চেহারা নিয়ে পড়ে থাকতো, আর তিনি সব সময় গীতা-পাঠ করতেন। নিজের হাতে রান্না-বান্না করে খেতেন। খাওয়া তো শুধু তিন মুঠো লাল চালের ভাত, আর একবাটি কাঁচা কলাইয়ের ডাল। কিন্তু তাবপর দেখা গেল, তিনি উপোস করে দিন পার করে দিচ্ছেন। তার মানে, লাল চালের ভাত আর কাঁচা কলাইয়ের ডাল খাওয়ার মত পয়সাও আর ছিল না। কিন্তু আমরা যারা তখন এখানে ছিলাম, তারা প্রত্যেকে পালা করে প্রতি সপ্তাহে ফকিরবাবুর ঘরে ডাল ভাত তরকারী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতাম। ফকিরবাবু আশ্চর্য হয়ে, খুশি হয়ে আর হাত তুলে আশীর্বাদ করতেন,—জয় হোক তোমাদের, জয় হোক।

ফকিরবাবু আমাদের কাছে মাঝে মাঝে নানারকম জ্ঞানের কথা বলতেন। সংসারের জীবনটা হলো সত্য-মিথ্যের ধর্ম-অধর্মের আর পাপ-পুণ্যের যুদ্ধ। জয় হবে তারই, যে সত্যকে আশ্রয় করে থাকে। এইরকম কথা, শুনছিস সুমি, তোর কলেজের পড়ার একটা বইয়েতে দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে।

সুমিতা—না, অন্য কোন বইতে দেখে থাকবে।

হেমন্তবাবু—তোদের কলেজের পড়ার বইয়ে তবে কি কোন···

সুমিতা হাসে—হিস্ট্রিতে যুদ্ধের কথা পড়েছি। কিন্তু ওসব ধর্ম যুদ্ধ-টুদ্ধের কথা নয়।

হেমন্তবাবু—তবে কোন্ যুদ্ধের কথা?

সুমিতা—ওয়ার অফ রোজেস। লাল আর সাদা, দুই গোলাপের যুদ্ধের কথা।

হেমন্তবাবু—সে যুদ্ধের কথা তো আমরাও স্কুলের হিস্ট্রি বইয়ে পড়েছিলাম। এখনও মনে পড়ে, সব ভুলে যাই নি। কিন্তু ওরকম যুদ্ধের মানেটা যে কী, তা আজও বুঝে উঠতে পারি নি।

সুমিতা মুখ টিপে হাসে—তোমার এসব কথা যদি শুনতে পান আমাদের সেই পাটনা হোস্টেলের মালতীদি, তবে তোমাকে যুদ্ধ-বিরোধী একটা ভীরু প্যাসিফিস্ট বলে নিন্দে করবেন।

হেমন্তবাবু—তোদের মালতীদির কাছ থেকে কোন চিঠি পেয়েছিস কি?

সুমিতা—না।

হেমন্তবাবু—যে-মানুষ তোকে এত ভালবাসতো, সে এই তিন বছরের মধ্যে তোকে একটা চিঠিও দিলে না?

সুমিতা—দিলেন না যখন, তখন আর কী বলবারই বা আছে?

হেমন্তবাবু বোধহয় একটু আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু সুমিতা আশ্চর্য হয় নি। বীরবাঁধের একজন হেমন্তবাবুর ভয়ানক দুর্ভাগ্যের খবর শুনেও যখন মহীতোষ কাকা আর মাধবপুরের মেজমামা, যাঁরা আপনজন, তাঁরাই কোন চিঠি দেন নি, তখন হোস্টেলের মালতীদির কাছ থেকে চিঠি না আসা কী এমন নতুন বিস্ময়ের ব্যাপার?

কোন সন্দেহ নেই, খুব সত্যি কথা, হোস্টেলের সব মেয়ের মধ্যে সুমিতাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন মালতীদি। বছরের প্রত্যেকটি বড় ছুটি শেষ হবার পর বীরবাঁধ থেকে যখন পাটনাতে গিয়ে মালতীদির হোস্টেলে উঠেছে সুমিতা, তখন মালতীদির জন্য নানা উপহারের অন্তত তিন-চারটি ঝুড়ি আর প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। চারুবালা নিজের হাতে ক্ষীরের সন্দেশ তৈরি করে একটা ছোট ঝুড়িতে ভরে দিয়েছেন। আর একটা ঝুড়িতে বীরবাঁধের

ম্যাককেনা সাহেবের বাগানের পেঁপে। তৃতীয় ঝুড়িতে বীরবাঁধের মটরশুঁটি কিংবা নতুন সব্জি। মধুপুর থেকে অনেক চেষ্টা করে যোগাড় করা ঢাকাই শাড়িকে কয়েকটা সিল্ক-পিসের সঙ্গে জড়িয়ে ও প্যাকেট করে হেমন্তবাবু আর চারুবালা পাটনাতে তাঁদের মেয়ের স্নেহশীলা অভিভাবিকা মালতীদিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরাই কৃতার্থতা বোধ করেছেন। চারুবালার কাছে চিঠি লিখে মালতীদি তাঁর আনন্দের কথা জানাতেন।—উপহার পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু এত উপহার কেন? প্রসাদের যেমন সামান্য একটু কণিকাও প্রসাদ, তেমনই প্রীতি-উপহারের সামান্য একটি জলছবিও প্রীতি-উপহার। শুনেছি, আপনাদের বীরবাঁধের টমেটো খুব ভাল, দেখবার মত জিনিস।

দেরি করেন নি হেমন্তবাবু, বড়দিনের ছুটি শেষ হবার পর সুমিতার সঙ্গে দুই ঝুড়ি টমেটো মালতীদির জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠি দিয়েছিলেন মালতীদি—ধন্যবাদ!

কী যেন চিন্তা করে নিয়ে নতুন একটা গল্প শুরু করেন হেমন্তবাবু।—আমার বয়স তখন একুশ কি বাইশ। সাতদিন জঙ্গলে ঘুরে, এক-একটা খনির গুদামের দরজায় ধর্ণা দিয়ে দিয়ে সস্তায় কিছু অভ্র যোগাড় করেছিলাম। কিন্তু সাতটা দিনই বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছিল। সস্তা অভ্র পেলাম বটে, কিন্তু নিউমোনিয়া হয়ে গেল। বুঝে দেখ, ডাক্তার থাকে ওই মধুপুরে, আর এখানে কোন কবরেজও ছিল না। কিন্তু আমার কি কোন দুশ্চিন্তা করতে হয়েছিল? একটুও না। আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করে, ডাক্তার এনে দেখিয়ে আর ওষুধ খাইয়ে, বুকে মালিশের ওষুধ মেখে দিয়ে, শেষে মাগুর মাছের ঝোল আর পুরনো চালের ভাতের পথ্যি খাইয়ে আমাকে সারিয়ে তোলবার মানুষের অভাব হয় নি। আমি তো শুধু দুই চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ে থাকতাম মাটির ঘরের ভিতরে একটি খাটিয়াতে। কে ওষুধ নিয়ে এল, কে মাথা টিপে দিয়ে চলে গেল, কিছুই বুঝতে

পারতাম না। কিন্তু শেষে সবই বুঝেছিলাম। আসতেন কালাচাঁদবাবু, আসতেন ওভারসিয়ার ধীরু সামন্ত ও তাঁর স্ত্রী। আসতেন বংশীবাবু ও তাঁর মা। ওই রঘুর বাবা তখন সবেমাত্র এখানে এসে দুটো মোষ আর তিনটে গরু নিয়ে দুধের কারবার শুরু করেছে। রঘুর বাবা বৈদ্যনাথও আসতো। ওরা কেউ আজ আর বেঁচে নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কোথায় যে মানুষগুলি চলে গেল!

সুমিতা—তাহলে বল, তোমাদের সেই বীরবাঁধ আর এই বীরবাঁধ একই বীরবাঁধ নয়?

হেমন্তবাবু—তাই তো মনে হয়। কিন্তু বুঝতে পারি না···

যে-কথা বলতে চাইছেন হেমন্তবাবু কিন্তু মুখ খুলে বলে ফেললেন না, সে-কথাটা খুবই বুঝতে পারে সুমিতা। আজকের বীরবাঁধ যেন দুঃখবোধ কিংবা মায়াবোধ করতেই ভুলে গিয়েছে। দুপুরবেলার রোদে, সড়কের উপর দিয়ে গাড়ি টেনে চলতে চলতে গাড়ির মোষটা যখন মুখ থুবড়ে পড়ে যায় আর ধুঁকতে থাকে, তখন কেউ হেসে ফেলে না, কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া মোষটাকে খোঁচা দিয়ে আরও ব্যথিত করে না। কিন্তু আজকের এই বীরবাঁধের মানুষগুলি একটি মানুষের দুর্ভাগ্যের জীবনটাকে যেন খোঁচা দিয়ে দিয়ে হাসছে। সবাই যেন হেসে সুখী হবার মত একটা ঘটনাকে কাছে পেয়েছে।

হেমন্তবাবু বলেন—আমাদের সময়ে, তার মানে পঞ্চাশ বছর আগে অনেক রকমের হিংসেহিংসি ছিল বটে, কিন্তু এরকমের ভয়ানক হাসাহাসি ছিল না। কিন্তু তুই কেন গান-টান একেবারেই ছেড়ে দিলি, সুমি?

সুমিতা—আমার গান শুনলে তোমার এই বীরবাঁধ হাসাহাসি করবে।

হেমন্তবাবু—ছবি আঁকবার শখটাও কি ছেড়ে দিলি?

সুমিতা—হ্যাঁ।

হেমন্তবাবু—বই-টই পড়তেও কি আর ভাল লাগে না?

সুমিতা—না।

হেমন্তবাবু—এরকম করে লাভ কি? ঘি-মাখন কিনতে পয়সা লাগে, পয়সার হিসেব করে সাবধান হতে হয়। কিন্তু তোর গান গাইতে, ছবি আঁকতে আর বই-টই পড়তে তো পয়সার দরকার হয় না!

সুমিতা মুখ লুকিয়ে হাসে—যেটা দরকার সেটাই যে হয় না!

হেমন্তবাবু—কী?

সুমিতা—ইচ্ছে। আমার আর ওসব নিয়ে ব্যস্ত হতে ইচ্ছেই করে না, বাবা। ওরা হাসাহাসি করবে, সেই ভয়ে নয়। আমি ওসব হাসাহাসিকে একটুও ভয় করি না। আমার আর ছবি গান বই-টই ভালই লাগে না।

হেমন্তবাবু—তবে আমি আর কী বলতে পারি? কী বলেই বা তোকে বোঝাবো? ঠিক কথা, ষাট টাকা মাইনের চাকরি খাটতে হয় যাকে, নিজের হাতে ছেড়া চটি সেলাই করে নিতে হয় যে-মেয়েকে, সে কেন···

ফুঁপিয়ে ওঠেন হেমন্তবাবু।—আমার যে-মেয়ে একদিন সন্দেশ খেতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিত, সে মেয়ে আজ খুশি হয়ে একছিটে চিনি মিশিয়ে ভাতের গরম ফ্যান খায়। এই দৃশ্য দেখিয়ে ভগবান আমাকে কেন যে শাস্তি দিচ্ছেন, বুঝি না।

সুমিতা—তুমি কিন্তু খুব বাজে কথা বলছো, বাবা। তুমি জান না, পাটনাতে মালতীদির হোস্টেলে আমরা সবাই, সান্ত্বনা স্বপ্না ভারতী চিন্ময়ী আর করুণা, সবাই কিচেনে গিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে কতবার এক গামলা গরম ফ্যান আদায় করে নিয়ে, তার মধ্যে চিনি ঢেলে দিয়ে আর ফুর্তি করে খেয়েছি! স্বপ্না বলত, এটা হল প্লাস্টিক পায়েস।

হেমন্তবাবু হাসেন—তার মধ্যে কি একটুও দুধ দিতিস না?

সুমিতা—না।

হেমন্তবাবু—তাহলে ওটা পায়েস হল কি করে?

সুমিতা উঠে দাঁড়ায়—দশটা বেজেছে।

হ্যাঁ, দশটা বেজেছে। ম্যাককেনা সাহেবের গালাকুঠিতে ঘণ্টা বাজছে।

হেমন্তবাবু—হ্যাঁ, আর দেরি করা উচিত নয়। ভানুর চোখ ঢুলু ঢুলু করছে। খেয়ে নে, খেয়ে নে ভানু।

মেঝের মাদুর তুলে নিয়ে আসন পাতে সুমিতা।

সবারই খাওয়া যখন শেষ হয়, তখন সুমিতা একটা নতুন বিস্ময়ের কথা বলতে শুরু করে।—ষাট টাকা মাইনের এই চাকরিটাও যাই-যাই করছে, বাবা।

—অ্যাঁ? কেন, কী হল?

সুমিতা—স্কুল-কমিটির শ্যামবাবু আর জিতেনবাবু বলেছেন, টীচারের মাইনের ত্রিশ টাকা আর দিতে পারবেন না কমিটি। কারণ, কেউ আর চাঁদা দিতে চান না। রেল-কোম্পানি যে ত্রিশ টাকা দেয়, তাই মাইনে হিসাবে টীচারকে দেওয়া হবে।

—মাত্র ত্রিশ টাকা?

সুমিতা—হ্যাঁ। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, আমি কালই একবার মধুপুরে যাব।

—কেন?

সুমিতা—রেলওয়ের এই সার্কেলের এডুকেশন অফিসার কাল মধুপুরে আসবেন। তাঁর কাছে গিয়ে বলব, বীরবাঁধের স্কুলের জন্য রেল-কোম্পানি যেন গ্র্যান্ট বাড়িয়ে দেন। টীচারকে অন্তত একশো টাকা মাইনে দেওয়া উচিত।

—বলতে পারিস। কিন্তু বললেই কি···না, এ-জীবনে আর ভরসা করতে পারছি না যে, যা হওয়া উচিত তাই হবে।

সুমিতা—ভরসা আমারও নেই। তবু একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

॥ ছয় ॥

সকালবেলা সুমিতাদের বাড়ির কুয়োতলাতে দাঁড়িয়ে জলের বালতি হাতে নিয়ে ভানুর সঙ্গে গল্প করছে রঘুর মা।

তার পরেই ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে ডাক দেয়—বেটি, তুমি নাকি আজ মধুপুরে যাবে?

—হ্যাঁ, যাব।

রঘুর মা—একাই যাবে?

—তুমি যদি সঙ্গে না যাও, তবে একাই যাব।

রঘুর মা—তাই বল! আমি তো সঙ্গে যাবই। ঘরের মেয়ে তুমি, একা একা দূর জায়গাতে যাবে, আমি বুঝি চুপ করে বসে বসে দেখবো? তা হবে না।

—কেন? কোথাও একা যাবার সাহস কি আমার নেই?

রঘুর মা—সাহস আছে জানি। কিন্তু এমন সাহস না করলেই ভাল।

—কেন?

রঘুর মা—কেন আবার কি? তোমার বয়সে আর চেহারাতে ওরকম সাহস মানায় না। হ্যাঁ, এখানে একা একা মন্দিরে যাও, প্রিয়বাবুর বাড়িতে যাও, ইস্কুলে যাও। দেখতে খারাপ লাগবে না। কিন্তু একা একা মধুপুরে যাবে কেন? দেখতে পেয়ে লোকের সন্দেহ হবে, মেয়ের মাথায় বুঝি ছিট আছে।

—আমার মাথায় কি ছিট নেই?

রঘুর মা—না।

—তবে চল। তৈরী হয়ে নাও। সকাল সাড়ে আটটার ট্রেনে যেতে হবে।

রঘুর মা—আমার তৈরী হতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। বেশ হলো, তোমার সঙ্গে থাকা হবে, আমার ননদ কৌশল্যাকেও একবার

দেখে আসা হবে। শুনেছিলাম, কৌশল্যার মেয়ের বিয়ের কথা চলছে। কিন্তু অনেক দিন হলো আর কিছু শুনি নি। কে জানে, বিয়ের কথা বুঝি ভেঙেই গিয়েছে।

আটটা বাজে নি বোধহয়, পাঁচ-দশ মিনিট বাকি আছে বলে মনে হয়, কিন্তু আর দেরি না করে রওনা হয়ে গেল সুমিতা। সুমিতার সঙ্গে সঙ্গে মস্তবড় একটা পোঁটলা হাতে নিয়ে রঘুর মা-ও চলে গেল।

হেমন্তবাবুর চোখের তারা ছুটো চঞ্চল, যেন অদ্ভুত একটা জ্বালা লেগে ছটফট করছে। সকালবেলার ঠাণ্ডা রোদটাকেও মনে হয় খুব কড়া রোদ। সুমিতার মাথাটাকে বোধহয় পুড়িয়ে দিচ্ছে এই রোদটা।

রাণু বড় গম্ভীর, যদিও সুমিতা হেসে হেসে বলেছে—রাণুর জন্যে একটা নতুন জিনিস নিয়ে আসবোই আসবো।

হয় একটা ভাল বাঁশি, নয় রঙীন রবারের একটা বড় বল ভানুর জন্য কিনে আনা হবেই হবে। সুমিতা অনেক আদর করে ভানুর গম্ভীর মুখটাকে হাসাতে চেষ্টা করেও হাসাতে পারে নি। ভানু কেঁদে ফেলেছে। ভানু বলেছে, আমার বাঁশি-টাশি কিছুই চাই না। তুমি মধুপুরে যাবে না, দিদি। তাহলে আমিও দানাপুরে চলে যাব।

মধুপুরের রোদে কিন্তু একটুও জ্বালা ছিল না। আকাশে জমাট মেঘ, আর বাতাসও উতলা হয়ে যেন ধুলোখেলা খেলছে। মধুপুরে এসে প্রথম একটা ঘণ্টা রঘুর পিসির বাড়িতে কাটিয়ে দিতে হলো, আর পিসির আদুরে ভদ্রতায় মোটা-মোটা কয়েকটা জিলিপীও খেতে হলো। দশটা বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ। এডুকেশন অফিসার নিশ্চয় এখন তাঁর কাজের ঘরে এসে গিয়েছেন। স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যাবে, এখন কোথায় আর কোন্ অফিসঘরে আছেন এডুকেশন অফিসার। হাতের ঝোলার ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আবেদনের চিঠিটাকে আর একবার ভাল করে পড়ে নেয় সুমিতা।

এডুকেশন অফিসার ভদ্রলোকের খোঁজ করতে বেশ দেরি হয়ে গেল। রঘুর মা'র একটা উতলা ফুর্তির জন্যেই এই দেরি। ননদের মেয়ের বিয়ের কথা ভাঙে নি, বিয়ে হবে, এই মাসেই। রঘুর মা সুর করে আধঘণ্টা ধরে রাম-সীতার বিয়ের ছাপরাই ভাষার একটা গীত গেয়েছে।

স্টেশনমাস্টার অনেক চেষ্টা করে মুখটা তুললেন, সুমিতার দিকে একবার তাকালেন, তারপর সুমিতার জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন—এখন আর এখানে কোন অফিসঘরে নয়, এডুকেশন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হলে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুমের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আর্দালি আছে, তাকে জিজ্ঞেসা করবেন, কখন দেখা হতে পারে, কিংবা তিনি দেখা-টেখা দিতে পারবেন কি পারবেন না।

আর্দালি নয়, ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। ইনিই কি এডুকেশন অফিসার?

সুমিতার প্রশ্নের কথাটা শুনতে গিয়ে ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিটা যেন একটু নিবিড় হয়ে গেল। হাত তুলে ঘরের ভিতরের দিকটাকে দেখিয়ে দিয়ে জবাব দিলেন ভদ্রলোক—না, আমি নই, এডুকেশন অফিসার এখন ভিতরে আছেন, কাজ করছেন।

—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই!

—আপনি কি তাঁর কোন আত্মীয়া?

—না, আমি একটা দরখাস্ত দিতে চাই। তাঁকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

—তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার জিজ্ঞাসা করে আসি···আচ্ছা, আপনার দরখাস্তটাই দিন, তাঁর হাতে দিয়ে দিই। দেখি, তিনি কী বলেন! যদি আপনার কথাও শুনতে চান, তবে ভালই। আমি এসে আপনাকে খবর দেব।

পাঁচ মিনিট পরে ভদ্রলোক ফিরে এসে বলেন—আসুন!

সুমিতার সঙ্গে রঘুর মা-কেও এগিয়ে আসতে দেখে ভদ্রলোক হাসতে থাকেন।—ইনিও আসবেন নাকি?

সুমিতা—যদি মনে করেন যে···

ভদ্রলোক—আচ্ছা, আসুন আসুন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে অফিসারের টেবিলের কাছে আর-এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন ভদ্রলোক।

এডুকেশন অফিসার খুবই জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার একটি প্রৌঢ় মানুষ। মাথার সবটাই সাদা নয়, কিন্তু দুই ভুরু একেবারে সাদা। চশমার সোনার ফ্রেম সাদা ভুরুর উপর যেন চেপে বসে রয়েছে।

এডুকেশন অফিসার বলেন—বীরবাঁধের রেল-কলোনির প্রাইমারী স্কুলের জন্যে আরও টাকা বরাদ্দ করবার কোন মানে হয় না। স্কুলের পড়াশোনার রিপোর্ট ভাল নয়। কমিটির চারজন মেম্বারের মধ্যে তিনজনই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, বর্তমান টীচার ভাল করে পড়াতে পারেন না, ভাল করে পড়াবার যোগ্যতাই তাঁর নেই। তুমি তো গ্র্যাজুয়েট নও!

—আজ্ঞে না। কিন্তু···

—কি?

—আমি যতদূর সাধ্যি ভাল করে পড়াতে চেষ্টা করি। এ বছরের পরীক্ষাতে আমাদেরই স্কুলের ছাত্রী মৃদুলা রঙ্গনাথন জেলার সব ছাত্রীদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে।

—অ্যাঁ? অডিটার রঙ্গনাথনের মেয়ে কি তোমারই ছাত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওরকম ছাত্রী আর কতজন আছে?

—মোট আশিজন ছেলে-মেয়ে আমাদের স্কুলে পড়ে।

—অ্যাঁ? আশিটা ছেলে-মেয়েকে তুমি একাই পড়াও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা হলে তো তোমাকে অনেক ভুগতে হয়। আশিটা বাচ্চা

ছেলে-মেয়ে মানে তো আশিটা খরগোশ আর বিড়াল! টীচারকে পাগল করে ছেড়ে দেবে! তুমি ওগুলোকে সামলাও কি করে?... যা-ই হোক। আমি ভাবছি, মিছিমিছি একটা স্কুল-কমিটি রাখবার কোন দরকার নেই। সার্কেলের একজন ইনস্‌পেক্টর মাঝে মাঝে এসে স্কুলের রিপোর্ট নিয়ে যাবে। ব্যস্!...সাদা ভুরুর উপর চশমার সোনার ফ্রেম একটু চেপে দিয়ে আবার কথা বলেন এডুকেশন অফিসার—কিন্তু তোমার মাইনের জন্য অত টাকা বরাদ্দ করা একেবারেই সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, স্কুল-কমিটি যখন ত্রিশটা টাকাও চাঁদা করে যোগাড় করতে পারবেন না, তখন ওই ত্রিশ টাকা রেল-কোম্পানি থেকে সরকারীভাবে দেওয়া হবে। তোমার মাইনে ষাট টাকাই থাকবে।-- আচ্ছা, সত্তর টাকাই করে দিলাম।

হাত তুলে নমস্কার জানায় সুমিতা। রঘুর মা একেবারে মাথা ঝুঁকিয়ে দু'হাত তুলে নমস্কার জানায়।

সুমিতা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায়, সেই ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। সুমিতা বলে—নমস্কার, আমরা এখন যাই।

—এখন বোধহয় বীরবাঁধে ফিরে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এখনই তো কোন ট্রেন নেই!

—বেলা দেড়টায় একটা ট্রেন আছে।

—খবর বোধহয় আপনি পান নি যে, বেলা দেড়টার ট্রেন আজ আর যাবে না।

—কেন? কী হলো?

—একটা গুড্‌স্ ট্রেন বীরবাঁধ থেকে তিন মাইল দূরে ডিরেল্‌ড্ হয়ে পড়ে গিয়েছে। লাইন বন্ধ। বুঝতে পারা যাচ্ছে না, লাইন পরিষ্কার হতে কত সময় নেবে। ট্রাফিকের কর্তাবাবুরা বলছেন, লাইন পরিষ্কার হতে রাত পার হয়ে যাবে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের শান্ত ভাষার নিদারুণ খবরগুলি

শুনতে থাকে সুমিতা। মনে হয়, ভানু বোধহয় এখনও বারান্দাতে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সুমিতার মুখের চেহারাটা হঠাৎ ভয়ে আর উদ্বেগে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

ভদ্রলোক বলেন—হতে পারে, হয়তো মাঝরাত্রির আগেই লাইন পরিষ্কার হয়ে যাবে, আর, বেলা দেড়টার ট্রেন হয়তো রাত দেড়টায় ছাড়বে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া আপনার কোন উপায় নেই।—আচ্ছা—হ্যাঁ—এডুকেশন অফিসার এই মুখার্জী সাহেবের বড়ছেলে বোধহয় আজ সন্ধ্যাবেলা নিজের জীপে বীরবাঁধের শালজঙ্গলে হরিণ শিকারের জন্য বের হবে। বলেন তো ব্যবস্থা করে দিতে পারি, সন্ধ্যাবেলাতেই এই জীপে বীরবাঁধে চলে যেতে পারেন।

সুমিতা—না।

রঘুর মা মাথা নাড়ে—না।

ভদ্রলোক—আপনাদের বীরবাঁধে জনার্দন নামে কেউ আছে?

সুমিতা—হ্যাঁ, আছে। জনার্দনবাবুকে আপনি চেনেন?

—ছেলেবেলাতে জনার্দন আর আমি একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম। শ্রীরামপুরের স্কুলে। জনার্দন বলতো, বীরবাঁধে পাহাড়ের কাছে ওদের অনেক জমি আছে। পনেরো বছর হলো, জনার্দনের সঙ্গে আমার কোন দেখা-সাক্ষাৎ আর হয় নি। জানি না, জনার্দন এখন কী করছে?

সুমিতা—জনার্দনবাবু মুকুটধারীবাবুর কাছারিতে কাজ করেন।

—কিসের কাজ?

সুমিতা—মুহুরীর কাজ।

—বুঝলাম, এই পনেরো বছর ধরে বোধহয় মুহুরীর কাজই করছে জনার্দন। আপনিও অনেক দিন বীরবাঁধে আছেন?

সুমিতা—হ্যাঁ। বীরবাঁধে আমাদের বাড়ি।...আচ্ছা, আমরা এখন চলি।

—বীরবাঁধে নিশ্চয় কোন হাইস্কুল নেই, কোনদিনও ছিলও না?

সুমিতা—নেই, ছিলও না।

—তবে পড়াশোনা করলেন কোথায়?

—পাটনাতে।

—পাটনাতে আপনাদের কে থাকেন?

সুমিতা—কেউ না। আমি হোস্টেলে থাকতাম।

—কোন্ হোস্টেলে? যে হোস্টেলের নাম মালতীদির হোস্টেল, সেখানে থাকতেন নাকি?

সুমিতা হেসে ওঠে।—মালতীদির হোস্টেলের শুধু নাম শুনেছেন, না দেখেছেনও?

—শুধু নাম শুনেছি। মালতীদিরও শুধু নামটা শুনেছি। তাঁকে কখনও দেখিনি। তিনি হলেন আমারই এক মামীমার আত্মীয়া, বোধহয় খুড়তুতো দিদি।

সুমিতা—আমরা এখন যাই।

—আচ্ছা।

প্ল্যাটফর্মের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত হেঁটে আর ঘুরে নিয়ে, শেষে একটা শেডের নীচে একটা খালি বেঞ্চির কাছে এসে হাঁফ ছাড়ে সুমিতা।—এখানেই বসে থাকি, রঘুর মা।

রঘুর মা—তা তো বসে থাকতেই হবে। তোমাকে নিয়ে কৌশল্যার বাড়িতে গিয়ে আট-দশ ঘণ্টা বসে থাকতে আমার ইচ্ছে করছে না।

—না, কোথাও আর যাব না। এখানেই বসে থাকব।

রঘুর মা—বাজারে একবার যাবে না? রাণুর জিনিস ভানুর বাঁশি কিনবে না?

সুমিতা—না।

রঘুর মা—না বেটি, চল, বাজারটা এখনই একবার ঘুরে আসি। আমি যখন সঙ্গে আছি, তখন তোমার কিসের এত ভয়?

শাদরি করে না সুমিতা। কিন্তু বাজারের ভিড়ের মধ্যে যাবার আর

দরকার হয় না। স্টেশনের কাছে, প্রথম সড়কের ছ'পাশের ছ'সারি দোকানের মধ্যে একটি দোকান থেকেই ভান্নুর বাঁশি আর রাণুর জন্য ছটো রঙীন জিনিস কিনে ফেলে সুমিতা। এক শিশি কুমকুম আর ছবি আঁকবার রঙীন পেনসিল এক ডজন।

কী আশ্চর্য, সেই ভদ্রলোক এই দোকানের সামনের সড়ক দিয়েই হেঁটে চলে গেলেন। গায়ের সাদা পাঞ্জাবির হাত ছটো গোটানো, ঢিলে পায়জামা পরা এই ভদ্রলোক সত্যিই কি মুখার্জি সাহেবের আর্দালি? পাঞ্জাবি-পায়জামার চেহারা যদিও একটু ময়লা-ময়লা, আর পায়ের চটিজোড়ার একটা চটি ছেঁড়া-ছেঁড়া, তবু আর্দালি বলে তো মনে হয় না!

রঘুর মা-র একটা ইচ্ছের কথা শুনে বিরক্ত হয় সুমিতা। আপত্তি করে—না রঘুর মা, আমি কোন দোকানে বসে জিলিপী-কচুরী খেতে পারব না। আমার ওরকম রাক্ষুসে ক্ষিদে পায়নি।

রঘুর মা—কিন্তু আমার তো পেয়েছে!

—বেশ তো। তুমি তোমার ঝোলা ভরে জিলিপী-কচুরী কিনে নাও। দোকানে বসে খেতে পারবে না।

রঘুর মা—তুমি কী খাবে?

—আমি শুধু জল খাব। এখানে নয়, আগে চল, স্টেশনের সেই বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসি, একটু জিরিয়ে নিই, তারপর।

রাগ করে রঘুর মা।—জল খাবে, না আমার মাথা খাবে?

জিলিপী-কচুরী কিনে নিয়ে, ছটো শসাও কিনে নিয়ে ঝোলার ভিতরে রাখে রঘুর মা।—চল এবার।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শেডের নীচে বেঞ্চির উপর বসে বসে মাত্র চারটি ঘণ্টা পার করে দিতে গিয়ে শরীরটা যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়বে কল্পনা করতে পারেনি সুমিতা। লোকের ভিড়ে এত ব্যস্ততা, এত আনাগোনা, ছুটোছুটি আর হুড়োহুড়ির দৃশ্যটা দেখে দেখে চোখ ছটোও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। স্টেশনটা কোন বিভীষিকার রা[illegible]না নয়,

তবু মনের ভিতরে কেমন-যেন একটা ভয়-ভয় ভাব থমকে রয়েছে! চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না সুমিতা, এ কেমন অদ্ভুত ভয়।

রঘুর মা'র জিলিপী-কচুরী আর শসাও খেতে হয়েছে সুমিতাকে। লোটা ভর্তি করে স্টেশনের কলের জল নিয়ে এসেছে রঘুর মা। জল খেয়ে সুমিতার তেষ্টাও মিটেছে। কিন্তু আর এখানে বসে থাকতে ও অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করে না। স্টেশনের সন্ধ্যাবেলার আলো জ্বলে উঠলেও সুমিতার মনের এই ভয়-ভয় অন্ধকারটা সরে যায় না।

রাত ন'টা, দশটা, এগারোটা। আর কত গভীর হবে রাত্রিটা? হাওড়ার এক্সপ্রেস চলে গেল। দানাপুরের প্যাসেঞ্জার চলে গেল, ফেরিওয়ালাদের হাঁক-ডাকও যেন ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করেছে।

ঝমঝমিয়ে কী ভয়ানক বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কখন থামবে এই বৃষ্টি? আর কখনই বা বীরবাঁধে যাবার ট্রেন ছাড়বে?

দুটো ক্লান্ত জাগা-চোখ নিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুমিতা। চোখ বন্ধ করে একটু ঝিমিয়ে নিতেও ভয় করে। রাণু আর ভানু কি এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি? দিদির জন্য ভেবে ভেবে ওরাও কি জেগে বসে আছে? ট্রেন ডিরেলড হয়েছে, খবরটা নিশ্চয় স্টেশনে এসে জেনে নিয়ে এতক্ষণে বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে রঘু। কিন্তু খবর শুনে তো আরও দুশ্চিন্তা করবেন বাবা। কিন্তু বাবা তো ভগবানে খুব বিশ্বাস করেন, তবে এত দুশ্চিন্তা কেন করবেন?

অনেক রাত। বোধহয় আর এক ঘণ্টা পরেই রাত শেষ হবে। কী আশ্চর্য, সেই ভদ্রলোক যেন নিশির ডাক শুনে আর হন্তদন্ত হয়ে সুমিতার ক্লান্ত প্রাণের আশ্রয় সেই বেঞ্চিটার একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভদ্রলোক হাসেন—আমি আরও কয়েকবার এসে দেখে গিয়েছি। বৃষ্টি শুরু হবার আগে দুবার, আর বৃষ্টি আসবার পরে একবার। আমার সন্দেহ হয়েছিল, আপনারা বোধহয় ভিজে-টিজে একেবারে একশা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভাল খবর আছে। বীরবাঁধে যাবার

ট্রেন আর দশ মিনিট পরেই ছাড়বে। ওই যে, দাঁড়িয়ে আছে যে নোংরা চেহারার ট্রেনটা, ওটাই এখন বীরবাঁধ হয়ে গোমো চলে যাবে।

সুমিতা উঠে দাঁড়ায়, হাসতে থাকে, চোখের তারাতে যেন হঠাৎ-উজ্জ্বল একটা খুশির আভা ঝিকঝিক করে কাঁপতে থাকে।—নমস্কার, আমরা তাহলে এখন ওই ট্রেনেরই কামরাতে উঠে বসে থাকি।

—হ্যাঁ।

ট্রেনের এঞ্জিনের বাষ্প যখন খুব জোরে শিস দিয়ে বেজে ওঠে, ক্লান্ত স্টেশনের ঘণ্টাও থরথর করে বাজতে থাকে, চলতে শুরু করে ট্রেন, তখন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয়ালের কাশ্মীরী হ্রদের একটা রঙীন ছবিকে দেখতে গিয়ে আরও একটা দৃশ্য দেখতে পায় সুমিতা। ওদিকের প্ল্যাটফর্মের উপর, শেডের নীচের সেই বেঞ্চিটার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। তাকিয়ে আছেন এই ট্রেনেরই চলন্ত চেহারাটার দিকে, শিস দিতে দিতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বাইরের মেঘলা অন্ধকারের মধ্যে এখনি উধাও হয়ে যাবে যে ট্রেন।

॥ সাত ॥

খবরটা যেন বীরবাঁধের হাসাহাসির উপর একটা জ্বালার ছোঁয়া, খড়ের গাদার উপর যেন আগুনের একটা ফুল্‌কির ছোঁয়া। হেমন্তবাবুর মেয়ে সুমিতা মধুপুরে গিয়ে রেল-কোম্পানির অফিসারদের ধরাধরি করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। সুমিতারই কাছ থেকে খবরটা প্রথম শুনেছেন প্রিয়নাথবাবু। প্রিয়নাথবাবুর মুখ থেকে শুনেছেন শ্যামবাবু আর জিতেনবাবু। তারপর সবাই শুনেছেন।

শ্যামবাবু বলেন—না, এই মেয়ে বীরবাঁধের প্রেস্টিজ একেবারে শেষ করে দিল।

জিতেনবাবু—বড়ই দুশ্চিন্তার কথা। যে মেয়ে মাইনে বাড়াবার জন্যে উপরওয়ালা অফিসারের ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারে, সে-মেয়ে কী না করতে পারে!

শ্যামবাবু—আমার মেয়ে যদি হতো, ওরকম অচেনা-অজানা এক ভদ্রলোকের ঘরে ঢোকবার চেয়ে বরং আত্মহত্যা করতো।

জিতেনবাবু—শুনেছি, কমিটিকেও জানিয়ে দেওয়া হবে যে, কমিটির দরকার নেই। রেল-কলোনীর স্কুল চালাবার সব দায়িত্ব নেবে রেল-কোম্পানি।

শ্যামবাবু—তার মানে আমাদের নামে অনেক চুগলি করে এসেছে ওই মেয়ে।

জিতেনবাবু—আমি তো প্রথম থেকেই এই মেয়েকে সন্দেহ করে-ছিলাম, টীচার হবার কোন যোগ্যতাই নেই এই মেয়ের। রামের পিসি, বেচারা বিধবা মানুষ, যার বয়সটা আর স্বভাবটা দু-ই বেশ ইয়ে···বেশ শান্ত, তাকে টীচার করলে আজ আর আমাদের এরকম একটা অপমানের খোঁচা সইতে হতো না।

শ্যামবাবু—হেমন্তবাবুর মনোবৃত্তিরও বলিহারি! মেয়ের রোজগারে খেতে-পরতে চাইবি তো একটু সাবধানও তো থাকবি! মেয়েকে যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াতে দিচ্ছিস কেন?

জিতেনবাবু—যেতে দিন মশাই, বাজে লোকের ব্যাপার নিয়ে এসব দুঃখের কথা বলবার দরকার নেই। ওই তো, দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে এসেছে। দশটা টাকা আবার টাকা নাকি!

শ্যামবাবু—দশ টাকা হোক দশ-শো টাকা হোক, ঘেন্নার ব্যাপারটা তো একই।

জিতেনবাবু—আমাদের এই প্রিয়নাথবাবু কিন্তু একটি অদ্ভুত মানুষ। শরীরে মেরুদণ্ড থাকলেও মনে কোন মেরুদণ্ড আছে কিনা সন্দেহ। হেমন্তবাবুর মেয়ে যে আমাদের সবাইকে অপমান করেছে, এটুকু বুঝতে গিয়েও তিনি দাঁড়কাকের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

শ্যামবাবু—গড়াতে দিন, গড়াতে দিন জিতেনবাবু। দেখুন, ঘটনার চাকা শেষ পর্যন্ত কতদূর আর কোথায় গিয়ে থামে!

মাথা দুলিয়ে হেসে ওঠেন জিতেনবাবু।—খানায় পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত থামবে না।

ভাগলপুরে গিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে একটি দিন থেকে বীরবাঁধে ফিরে এসেছেন পার্বতীবাবু। একাই এসেছেন, অলকা আসেনি। অবিনাশবাবু বলেছেন: আমাদের নিয়ম হল, নববধূ তিন বছরের মধ্যে পিত্রালয়ে যাবে না।

অলকার মা—এত লোক ভাল এঁরা, তবু এরকম একটা খারাপ নিয়ম মানেন কেন?

পার্বতীবাবু—সত্যি লোক ভাল। একটা চাকর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা শুধু আমারই যত্নের কাজ করেছে। অবিনাশবাবু অবিশ্যি আমার সঙ্গে ওই একটি কথা ছাড়া আর কোন কথা বলবার সময় পাননি; কিন্তু বাড়ির সরকার মশাই অনেক কথা বলেছেন।

অলকার মা—কী বললে ?

পার্বতীবাবু—যথেষ্ট ভদ্রতা করেছেন ওঁরা। শুধু মাছেরই পাঁচ-রকম রান্না, তার উপর কালো কচি পাঁঠার মাংস, তাছাড়া বাটি ভর্তি করে দই ক্ষীর পায়েস।

অলকার মা হেসে ফেলেন।—একটু সামলে খেয়েছিলে তো? না, কুটুম্বিনীর অনুরোধে পড়ে সবই ?

পার্বতীবাবু—আরে না না। কোন কুটুম্বিনী আমাকে অনুরোধ করেনি। খাওয়ার সময়ে কেউ আমাকে বিরক্ত করেনি। কেউ কাছেই আসেনি। না বড় কুটুম্বিনী, না কুটুম্বিনীর কোন মেয়ে।

অলকার মা—অ্যাঁ ?

পার্বতী—বাড়ির রান্নার ঠাকুরই শুধু একবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, শাক-চচ্চড়ি আরও লাগবে কি না।

—শুধু শাক-চচ্চড়ির নাম করলে কেন ?

পার্বতী—কে জানে কেন ? সরকার মশাই অবিশ্যি বললেন যে, ওটা এবাড়ির একটা নিয়ম।

—এ কী রকমের নিয়ম ?

পার্বতী—কে জানে, কেন ? মনে হয়, ওঁদের চেয়ে নীচু অবস্থার কুটুম হলে তাকে এরকম একটা ভদ্রতার কথা বলা ওঁদের নিয়ম।

—অলকা কী বললে ?

পার্বতীবাবু—কী যে বললে ভাল করে শুনতেই পেলাম না।

—অ্যাঁ ?

পার্বতীবাবু—অলকার শাশুড়ি সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। মাথাতে বড় ঘোমটা ঢাকা ছিল, কিন্তু হাতের দুটো আঙ্গুল তুলে রেখেছিলেন।

—কী বললে ?

পার্বতীবাবু—তার মানে বোধহয় এই যে, মাত্র দু মিনিট; মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বাপ যেন দু মিনিটের বেশি সময় না নেয়।

—এটাও ওঁদের একটা নিয়ম নাকি?

পার্বতীবাবু—তাই তো মনে হয়। বড়বউয়ের বাপ নাকি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে তিন মিনিট সময় পেয়েছিলেন।

—তুমি কী ঠাট্টা করবার জন্য বানিয়ে একটা গল্প বলছো?

পার্বতীবাবু—না, ঠাট্টা নয়, গল্পও নয়, আমি বানিয়েও কিছু বলছি না। ওঁদের তিন-চার পুরুষ ধরে এরকম ভদ্রতার একটা নিয়ম চলে আসছে।

—জামাই কী বললে?

পার্বতীবাবু—জামাই শুধু একবার তাকালেন আর হাসলেন।

—প্রণাম করলে না?

পার্বতীবাবু—না। ওঁদের নিয়ম হলো তিন বছর পরে যখন একদিন শ্বশুরবাড়িতে আসবে ওঁদের ছেলে, তখন ওদের শ্বশুর আর শাশুড়িকে প্রণাম করবে।

—কিন্তু অবিনাশবাবুর মেজছেলে ধীরেন তো বিয়ের ছ'মাস পরেই শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল। হালিসহরের পিসিমার ছোট জায়ের মেয়ে নিভারই তো বর ওই ধীরাজ। নিভার বাবা মেয়ের বিয়ের তিনমাস পরেই ভাগলপুরে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। অবিনাশবাবু সব সময় বেহাইয়ের কাছে থাকতেন, কত গল্প করতেন, নিজের হাতে পান সেজে খাওয়াতেন। সবই তো শুনেছি। কিন্তু এরকম নিয়ম-টিয়মের কোন কথা তো শুনিনি!

পার্বতীবাবু—নিভার বাবা অবিনাশবাবুর চেয়ে অন্তত পাঁচগুণ বেশি টাকা-পয়সার মানুষ।

—তাই বল। শুধু তোমার মত ইটের কারবারী কুটুম্বের জন্যই অবিনাশবাবুদের ওইসব নিয়ম কাজ করে।

পার্বতীবাবু—হতে পারে। কিন্তু···

—কী ?

পার্বতীবাবু—ওঁরা লোক ভাল।···হেমন্তবাবুর মেয়েটা অবিনাশবাবুদের নামে কথাটা কী যেন বলেছিল ?

—সুমিতা বলেছিল, ওঁরা ভাল লোক নন। ওঁরা ভাল লোক হতেই পারেন না।

হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন পার্বতীবাবু।—মেয়েটা কী সাংঘাতিক বুদ্ধির মেয়ে ! ভদ্রলোকের নামে চট্ করে এরকম একটা সন্দেহের কথা বলে দিল কেমন করে ? এরকম মেয়েকে চাবুক মেরে শাস্তি দিতে হয়।

পার্বতীবাবুর ক্ষিপ্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে ক্ষিপ্ত কথাগুলি শুনতে থাকেন অলকার মা। কী আশ্চর্য, তাঁর মুখের চেহারাটা করুণ হতে হতে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠেন অলকার মা—তুমি তোমার কপালটাকেও চাবুক মেরে শাস্তি দাও।

পার্বতীবাবু চিৎকার করেন।—লজ্জা করে না তোমার ? একটা হা-ভাতে বাড়ির বাইশ বছর বয়সের একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে বুদ্ধিতে এঁটে উঠতে পারলে না !

লাঠিভর দিয়ে হাঁটতে যদিও বেশ কষ্ট হয়, পক্ষাঘাতের পা-টা এখন সিঁড়ির ধাপ ধরে আস্তে আস্তে নামতে পারে। হেমন্তবাবু রোজই সকাল-বিকেল একবার পলাশতলা পর্যন্ত, একবার কুয়োতলা পার হয়ে পেঁপের বাগানটা পর্যন্ত হেঁটে বেড়াতে পারেন। হেমন্তবাবুর মনের খুশিটা যেন মনের জোর হয়ে মাঝে মাঝে কথা বলে ফেলছে—সত্যি, সেরে উঠব নাকি ? সুমি ?

সুমিতা—সেরে উঠবে বৈকি !

হেমন্তবাবু—জিতেনবাবু বলেছেন, মেয়ের দশ টাকা মাইনে বাড়তেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন হেমন্তবাবু।

সুমিতা—রঘুর মা'র কী যে অদ্ভুত অভ্যেস। তুনিয়ার এখান-সেখান থেকে কুড়িয়ে যত নোংরা গল্পের কথা নিয়ে আসবে আর

শোনাবে। রঘুর মাকে বলে দিতে হবে, তোমাকে যেন কখ্খনো কোন কথা না বলে।

হেমন্তবাবু—রঘুর মা এই যে তিনটে বছর ধরে···রোজ এক পো করে তিন বছরের দুধের হিসেবটা কী দাঁড়ায়, ভেবে দেখেছিস ?

—না।

হেমন্তবাবু—রঘুর মা-র টাকা কবে শোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় ?

—জানি না। টাকা নিশ্চয় একদিন শোধ করা সম্ভব হবে, কিন্তু ধার শোধ হবে না।

দেখতে পায়নি সুমিতা, হেমন্তবাবুরও চোখে পড়েনি, রঘুর মা এসে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে আর সব কথা শুনছে।

চেঁচিয়ে ওঠে রঘুর মা—আমি তো বেটিকে কবেই বলে দিয়েছি, তোমার হাত থেকে আমি টাকা নেব না। তোমার বর যদি দেয়, তবেই নেব। নইলে, কভি নেহি।

হেমন্তবাবু হাসেন—সে কী ?

সুমিতা—মহীকাকার কাছ থেকে টাকাটা আদায় হবার পর আমি রঘুর মা'কে কত করে বললাম, এইবার দুধের দামটা নাও। কিন্তু কিছুতেই নিলে না। ওর ওই এক অদ্ভুত কথা।

আজকাল সুমিতাদের বাড়িতে এসে কথায় কথায় বড় বেশি বক-বক করে রঘুর মা। আগে ঠিক এরকম অভ্যেস ছিল না। ওই দু-একবার যা বলেছে তার বেশি নয়। কিন্তু রঘুর মা'র নতুন মুখরতার এই কথাটা শুনলেই যেন চমকে ওঠে সুমিতার বুকের ভেতরটা। ভয় করে। অদ্ভুত ভয়।

এ বছরের আশ্বিন মাসে বীরবাঁধে ঝড়-বৃষ্টি দেখা দিল না। কিন্তু কুয়াশার ঘোর যেমন জোরও তেমন। সকালবেলার রোদের আভা যেন এই কুয়াশার ঘোর আর জোরের কাছে মিইয়ে যায়। আশ্বিন থেকে পৌষ পর্যন্ত চারটে মাস সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত

বীরবাঁধের জীবনটা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে পড়ে মিইয়ে যেতে থাকে। হেমন্তবাবুর মেয়ে সুমিতার জীবনে অবশ্য কোন অবসাদ নেই! একটুও মিইয়ে যায়নি সন্ধ্যাবেলার লুডো খেলার উৎসাহ। হেমন্তবাবু বলেন—আমিও খেলতে পারি, যদি তোরা আমার একটু-আধটু জোচ্চুরি মেনে নিস।

চেঁচিয়ে ওঠে ভানু—এস না কেন? যত ইচ্ছে জোচ্চুরি কর। কিন্তু আমি তোমাকে হারিয়ে দেবই দেব।

কে জানে কেন, পৌষের কুয়াশা হঠাৎ একদিন ফুরিয়ে গেল। ঝলমলে রোদ গায়ে লাগিয়ে রেল-কলোনির ছোট স্কুলবাড়ির সামনের আঙিনাতে লঙ্কা-জবার লাল টুকটুকে ফুল হাসে, তার উপর প্রজাপতির দল ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায়।

স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফিরে যাবার পথে এগিয়ে যেতেই চমকে ওঠে সুমিতা। চোখের ভুল না মনের ভুল? সেই ভদ্রলোকই কি জনার্দনদার সঙ্গে গল্প করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসছেন? অসম্ভব! দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। যাকে আর কোনদিনও দেখতে পাবে বলে মনে হয়নি, সে-ই সুমিতার দুই চোখের কত কাছে এসে দেখা দিয়েছে। শুধু চোখ দুটো নয়, সুমিতার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। সেই অদ্ভুত ভয়টা যেন সুমিতার নিঃশ্বাসের বাতাস এলোমেলো করে দিয়েছে।

বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। ভদ্রলোক নিশ্চয় ইচ্ছে করেই এখানে এসেছেন! জনার্দনদা এই ভদ্রলোকের ছেলেবেলার বন্ধু। বন্ধুকে এত বছর পরে আজ হঠাৎ মনে পড়েছে, তাই কি উনি হঠাৎ এখানে এসে পড়েছেন? হতে পারে। কিন্তু সুমিতার বুকের ভিতরের ভয়টাই যেন বলছে, না, সেজন্য নয় বোধহয়।

জনার্দনের সঙ্গে সেই ভদ্রলোক সুমিতার কাছাকাছি এসে, সুমিতার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার আগে শুধু একবার দাঁড়ালেন, আর শুধু একটি কথাই বললেন—চিনতে পারছেন?

সুমিতা—হ্যাঁ।

চলে গেলেন ভদ্রলোক। যেন জনার্দনের সঙ্গে গল্প করবার ঝোঁকে ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। বুঝতে পারে সুমিতা, জনার্দনদার সঙ্গে সেই ভদ্রলোক এক মিনিটের মধ্যেই অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। লজ্জার কথা, চমকে ওঠে সুমিতার বুকের ভিতরের সেই অদ্ভুত ভয়টাও, সুমিতাই থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

ভালই হয়েছে। বেশি কথা বললেন না ভদ্রলোক। বেশি কথা বললে সুমিতাকেও হয়তো বেশি কথা বলতে হতো। জনার্দনদা বোধহয় আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, তাঁর বন্ধু মানুষটার সঙ্গে এত কথা কেমন করে বলতে পারছে সুমিতা।

ভদ্রলোক যদি রোজই বিকেলে জনার্দনদার সঙ্গে এই পথে বেড়াতে আসেন, তবে? যদি রোজই ওই কথা জিজ্ঞাসা করেন, চিনতে পারছেন, তবে? তবে একদিন স্পষ্ট করে বলে দিতেই হবে, না, চিনতে পারছি না।

কিন্তু সুমিতার এই ভীরু মনের ভ্রূকুটির আশাটাও মিথ্যে হয়ে গেল। একটা মাস পার হয়ে গেল, তবু আর কোনদিন ভদ্রলোককে দেখতে পাওয়া গেল না। ভাল হলো। সুমিতার স্বস্তিহীন মনটার সব ভার যেন ঝরে পড়ে যায়। ভদ্রলোক এখানে নেই নিশ্চয়।

জনার্দনদার ছেলেবেলার বন্ধু, শুধু এই পরিচয়টুকু ছাড়া, ভদ্রলোকের নাম ধাম চরিত্রের কিছুই জানে না সুমিতা। ভদ্রলোক বীরবাঁধের একজন বাসিন্দা মানুষও নন। তবু, এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে এরকম একটা ভয় বোধ করতে হয় কেন? নিজের মনটাকেই জিজ্ঞাসা করে জানতে চেষ্টা করেছে সুমিতা। কিন্তু চেষ্টাই মাত্র, জানতে পারেনি। বরং মনে হয়েছে, এটা একটা মিথ্যে ভয়, বিনা কারণের ভয়। একটা শখের ভয়।

ভয় যাদের করা উচিত, তাদের তো একটুও ভয় করেনি সুমিতা,

করেও না। কত রকম ভয়ের কত রকমেরই না চেহারা দেখতে হয়েছে। হাতের তিন আঙুলে তিনটে সোনার আংটি পরে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের বেড়াবার জায়গা ওই সবুজ ঘাসের ডাঙার উপর শুয়ে বসে শিস বাজিয়ে গান করে নিত্যবাবুর যে দুর্দান্ত ভাগ্নে, মুঙ্গেরের মস্ত এক বনেদী বড়লোকের ছেলে, শঙ্কর যার নাম, যার সিল্কের পাঞ্জাবির পকেটটা সব-সময় হুইস্কির শিশির ভারে ঝুঁকে থাকে, তাকেও কোনদিন ভয় করেনি সুমিতা। রাত্রির অন্ধকারে কতবার এসে পলাশতলার কাছে দাঁড়িয়েছে সেই হুইস্কির শঙ্কর, গুন্‌গুন্‌ করে গান করেছে, তা'ও আবার রসের গান। তার দিকে তাকিয়ে সুমিতা কোনদিন জিজ্ঞাসাও করেনি—কে ওখানে দাঁড়িয়ে? কিন্তু একদিন শব্দ শুনে সুমিতার মাঝরাতের গভীর ঘুমটা ভেঙে যেতেই আর আলোটা জ্বালতেই দেখতে পেয়েছিল সুমিতা, তিন আঙুলে আংটি পরা একটা হাত সুমিতার ঘরের জানালা বাইরে থেকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। আর-একটা হাতে একশো টাকার কয়েকটা নোট ঝুলছে।

ঘরের মেঝের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আর জানালার দিকে তাকিয়ে শুধু কয়েকটা কথা বলেছিল সুমিতা।—কাটারী দিয়ে ওই হাতের উপর একটা কোপ দেব, না রঘুকে ডাকবো?

সেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তিন আঙুলে সোনার আংটি পরানো সেই হাত নিয়ে একটা কালো ছায়া। কিন্তু অদৃশ্য হয়ে সড়কের উপর উঠতে গিয়ে একটা আর্তনাদ করে আর মুখ থুবড়ে কাঁকরের উপর পড়ে গিয়েছিল কালো ছায়াটা। তার ধুলোমাখা মাথাটার উপর রঘুর হাতের লাঠিটা আবার প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে তুলে উঠতেই দুহাত দিয়ে রঘুর পা জড়িয়ে ধরেছিল সেই কালো ছায়া। তারপর আব কোনদিনও এ-বাড়ির ধারে-কাছে শঙ্করের গানের গুন্‌গুন্‌ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়নি।

শুধু দেখা গিয়েছে, শ্যামবাবুর বাড়ির হেনারাণী আর অপরাজিতা

যখন মহাবীরের পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে আয়নাতে তাদের লালঠোঁটের ছবি দেখে আর হেসে আকুল হয়, ঠিক তখন শঙ্করও হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাসতে থাকে। সবুজ ঘাসের ডাঙার দিকে যখন বেড়াতে চলে যায় হেনারাণী আর অপরাজিতা, তখন মহাবীরের দোকানের একটি পান গোলাপজলে চুবিয়ে নিয়ে আর মুখে পুরে দিয়ে শঙ্করও এগিয়ে যায়। ঘেসো ডাঙার ভরাট সবুজের শোভাটাও বনেদী শঙ্করের কাছে একটা নেশা।

সম্পর্কের হিসাবে প্রিয় জেঠামশাইয়ের দাদা হন, মাসতুতো দাদা, যিনি রায়পুর স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, সেই অনন্তবাবু বুদ্ধগয়া দেখে দেশের বাড়িতে ফিরে যাবার পথে দশটা দিন বীরবাঁধে ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল এবং বলেও ছিলেন যে, অন্তত একটা মাস এই বীরবাঁধে থাকবেন।—সত্যি প্রিয়নাথ, তোমাদের বীরবাঁধের শালজঙ্গল, ঘাসের ডাঙা আর নদীটা খুবই সুন্দর।

মনে আছে সুমিতার, কী ভয়ানক শুকনো মুখ নিয়ে অনন্তবাবু আর প্রিয় জেঠামশাই একদিন সন্ধ্যেবেলা হাঁপাতে হাঁপাতে সুমিতাদের বাড়ির বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন। অনন্তবাবু বললেন—বুড়োকে শিগ্‌গীর এক ঘটি জল দাও তো মা।

চোখে-মুখে বার বার জলের ঝাপ্‌টা দিলেন অনন্তবাবু। বার বার হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ-মুখ ধুয়ে নিলেন। জোরে একটা হাঁফ ছাড়লেন—না, আর তোমাদের এখানে একটি দিনও থাকব না, প্রিয়নাথ। আজই রাত্রির ট্রেনে আমি চলে যাব।

কী আশ্চর্য, প্রিয়নাথবাবু আপত্তি করে একটা কথাও বললেন না।

অনন্তবাবু জিজ্ঞেসা করেন—কে ওরা? ওরাও কি তোমাদেরই মত এই বীরবাঁধের মানুষ?

লাঠিভর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন হেমন্তবাবু—নমস্কার!

অনন্তবাবু—নমস্কার। আমি প্রিয়নাথকে জিজ্ঞেসা করছি, কে ওরা ?

প্রিয়নাথবাবু বলেন—ডাঙার দিকে বেড়াতে গিয়ে আর শ্যাম-বাবুর বাড়ির মেয়েদের কাণ্ড দেখতে পেয়ে দাদা দুঃখিত হয়েছেন, তাই জিজ্ঞেসা করছেন, কে ওরা।

অনন্তবাবু—দুঃখিত হয়েছি বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ঘেন্না বোধ করেছি আর ভয় পেয়েছি।

হেমন্তবাবু—ঠিক বীরবাঁধের মানুষ বলতে হলে মাত্র তিন-চার বাড়ির মানুষকেই বলতে হয়। প্রিয়দা, আমি, রঘুর মা আর—আর জনার্দন, এ ছাড়া ত্রিশ বছর আগের বীরবাঁধের কেউ তো নেই। হ্যাঁ, ম্যাককেনা সাহেব আর মুকুটধারীবাবুও আছেন।

অনন্তবাবু--তবে এরা কারা ?

প্রিয়নাথবাবু—আর সবাই এখানে এসেছেন, কেউ পাঁচ বছর, কেউ দশ বছর, কেউ বা কুড়ি বছর আগে। বলতে গেলে, এরা সবাই নতুন আগন্তুক মানুষ।

অনন্তবাবু—তাই বল! তা না হলে এরকমের নতুন অভিশাপ আর নতুন আবর্জনা এখানে আসবে কেমন করে ? আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারিনি প্রিয়নাথ, তোমাদের এই বীরবাঁধেও বোম্বাই দিল্লী ও কলকতা স্টাইলের কালচার ঘুরে বেড়ায়। আগে জানতে পারলে এখানে আসতামই না।

হেমন্তবাবু—কী ব্যাপার প্রিয়দা, বড়দা কেন এরকম ক্ষুণ্ন হয়েছেন ?

প্রিয়নাথবাবু—ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে খোলা মাঠের উপর ঢলাঢলি করবে আর বোতলের জল খাবে, এরকম কদর্য দৃশ্য দেখলে কে না ক্ষুণ্ন হবে ?···আচ্ছা, এবার আমরা চলি, হেমন্ত। বড়দা, চলুন।

ঘটনার কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সুমিতা। অনেক দিনের অনেক কুয়াশা যেন প্রিয় জেঠামশাইয়ের দাদা, সেই অনন্তবাবুর করুণ

মুখের ছবিটাকেও ঝাপসা করে করে প্রায় মুছেই ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আজ ঘরের কাজের নানা ব্যস্ততার মধ্যেই বার বার মনে পড়ছে, বুড়ো অনন্তবাবু খুব ভয় পেয়ে আর ঘেন্না পেয়ে যে-সব কথা বলেছিলেন। নতুন অভিশাপ, আর নতুন আবর্জনা বাইরে থেকে এসে বীরবাঁধের জীবনে অনেক ঘেন্না ছড়িয়ে দিয়েছে। তবে কি বিশ্বাস করতে হবে যে, জনার্দনদার ছেলেবেলার বন্ধু সেই মানুষটাও একটা আগন্তুক অভিশাপ কিংবা আবর্জনা? বীরবাঁধের জীবনে নতুন একটা ঘেন্না ছড়িয়ে দেবার মতলব?

না, আর এসব সন্দেহ আর দুশ্চিন্তা দিয়ে মনটাকে ত্যক্ত করবার কোন অর্থ হয় না। ভদ্রলোক তো চলেই গিয়েছেন, তবে আর এত ভয়-ভাবনা কেন?

স্কুলের চাকরি আর ঘরের কাজ, এছাড়া সুমিতার জীবনটাকে ব্যস্ত করে তোলবার মত কোন নতুন ঘটনা আর কী-ই বা দেখা দিতে পারে? কিছুই না। মাস ফুরিয়ে গিয়ে নতুন মাস আসে। বীরবাঁধের সড়কের দুপাশের শিরীষের পাতা ঝরে যায়, আবার নতুন করে পাতা দেখা দেয়। কিন্তু সুমিতার জীবনে ওরকম কোন নিয়ম নেই। সুমিতার প্রাণেও নেই। অনেকদিন আগে কুয়োতলার কাছে রক্তকরবীর একটা চারা পুঁতেছিল সুমিতা। সেটা অনেকদিন হলো বেশ বড় একটা গাছ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে গাছে আজও কোন ফুল ধরেনি। ভালই তো। এরকম বিনাফুলের রক্তকরবীর গাছের জীবনে কোন ভয় নেই। কেউ ওটার দিকে তাকাবে না, হাত বাড়িয়ে কাছে আসবেও না। ভাল-মন্দ কোন নতুন ঘটনার বাইরে পড়ে থাকাই তো শান্তি।

ঠিকই, সুমিতার জীবনে কোন নতুন ঘটনার ছায়া পড়ে না বটে, কিন্তু বীরবাঁধের কোন-কোন বাড়ির সুখের প্রাণকে যেন দাঁতওয়ালা আর নখওয়ালা এক-একটা নতুন ঘটনা এসে কামড়ে ধরছে আর ছিঁড়ছে। রঘুর মা বলে—বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে।

সুমিতা বলে—আঃ, রঘুর মা, তুমি আর আমাকে এসব ভয়ানক খবর শুনিও না। তুমি কি আমাকে সত্যিই একটা পাথর বলে মনে করেছ? ওসব খবর শুনলে আমার বুক কাঁপে, ভয় করে। তুমি কখ্খনো আর…

রঘুর মা কিন্তু নির্বিকার প্রসন্নতার একটি মুখ হাসিয়ে নিয়ে সুমিতার কাছে আরও নতুন ঘটনার খবর শোনাতে থাকে। সরে যায় সুমিতা।

দেখে এসেছে রঘুর মা, শ্যামবাবু একেবারে চুপসে-যাওয়া একটা মুখ নিয়ে জিতেনবাবুর বাড়ির বারান্দার উপর চুপ করে বসে আছেন। জিতেনবাবু বার বার জিজ্ঞাসা করছেন—কী ব্যাপার শ্যামবাবু? আপনাকে একটু বিমর্ষ বলে মনে হচ্ছে!

শ্যামবাবু—বিমর্ষ হবারই কথা। মেয়েটার দুঃসহ রকমের হার্টের কষ্ট দেখা দিয়েছে। তাই কলকাতাতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মেয়েটাকে, হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। বাড়িতে রেখে কোন ট্রিটমেণ্ট সম্ভব নয়।

কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে রঘুর মা।—কিন্তু শ্যামবাবুর বাড়ির দাই ফুলেশ্বরী আমাকে কী বলেছে, শুনবে বেটি?

সুমিতা—না।

রঘুর মা—ফুলেশ্বরী বলেছে বলেই জানতে পেলাম, ও মেয়ের রোগটা বুকের কষ্ট নয়, পেটের কষ্ট। পুরো সাত-মাসের কষ্ট। গিন্নী চেঁচিয়ে উঠেছেন, সর্বনাশ, যা হওয়া উচিত নয়, এ যে দেখছি তাই হয়েছে!

শ্যামবাবুর সেই চোপসানো মুখটাকে ছুছুন্দরের মুখের সঙ্গে তুলনা করে রঘুর মা। নইলে, সেদিন রাত্রিবেলা ছেলের-বউটা 'ওরে বাবারে' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই ছুছুন্দরের মত সুড়ুক করে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আর পালিয়ে গিয়ে জিতেনবাবুর বাড়ির সজনে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবেন কেন?

রঘুর মা বলে—তুমি কি শ্যামবাবুর বাড়ির সেই চিৎকার আর হল্লার একটুও আওয়াজ পাওনি ?

সুমিতা—না।

রঘুর মা—আমি পেয়েছিলাম। ফুলেশ্বরী বললে, শ্যামবাবুর ছেলে দেড় বছর পরে বাড়ি ফিরে এসেই কী যেন কী বুঝতে পেরেছে। হেনারাণী স্নানের ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়েছিল। কিন্তু সেই ছেলে দরজা ভেঙে স্নানের ঘরের ভিতরে ঢুকে হেনারাণীকে চাবুক মেরেছে। তারপর সেই চাবুক হাতে নিয়ে বাপকেও খুঁজেছে। কিন্তু ছুছুন্দর বড় চালাক, ছেলের হাতে মার খাবার আগেই সুড়ুক করে পালিয়ে গিয়েছে। ভোর হতেই চলে গিয়েছে ছেলে। বলে গিয়েছে, কোনদিন আর এ বাড়িতে সে ফিরে আসবে না।

হরনাথ পুরো ছ'টা মাস বিছানা থেকে উঠতে পারেননি, ম্যালেরিয়ার মত একটা জ্বরে আর বাতের মত কন্‌কনে একটা গা-ব্যথায় ভুগেছেন। অঞ্জলির মা বিধুময়ী কিন্তু বিনা জ্বরেই শুকিয়ে আর পাকিয়ে গিয়েছেন। হরনাথ এক গেলাস জল খেতে চাইলে রেগে ওঠেন বিধুময়ী।—বুড়ো শকুনের এত জলতেষ্টা কেন ? বিধুময়ী যখন বলেন—একটা টাকা দাও, চা আর চিনি কিনতে হবে ; হরনাথ তখন দাঁতে দাঁত ঘষে চেঁচিয়ে ওঠেন—চা আর চিনি আবার কেন ? বিষ খাও, বিষ খাও।

হরনাথের ঘরের সব আসবাব বিক্রী হয়ে গিয়েছে। বাড়িটাকে মুকুটধারীবাবুর কাছে বন্ধক রেখেছেন।

কিন্তু, অদ্ভুত আশ্চর্যের ব্যাপারই বলতে হবে। প্রিয়নাথবাবু একদিন অনেক দুঃখ করে হেমন্তবাবুর কাছে বলেছেন—এদের প্রাণের জোর দেখে আমি সত্যি খুব আশ্চর্য বোধ করি, হেমন্ত। শুনেছি আধমরা সাপ হাওয়া খেয়ে খেয়ে আবার তাজা হয় আর ফণা তুলে ছোবল দেবার জন্য ছটফট করে। এরাও প্রায় সেইরকমই প্রাণের জোর দেখাচ্ছে।

প্রিয়নাথবাবুর কথার আসল অর্থটুকু বুঝতে পারেননি হেমন্তবাবু, সুমিতাও পারেনি। কিন্তু সুমিতা পরে একদিন বুঝতে পারল। এডুকেশন অফিসার চ্যাটার্জী সাহেবের কাছ থেকে মস্ত বড় একটা খামের চিঠি এসেছে। ঠিক চিঠি নয়, একটা আবেদন-পত্র সুমিতাকে স্কুলের ঠিকানাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন চ্যাটার্জী সাহেব। সেই আবেদন-পত্রের মাথার একপাশে চ্যাটার্জী সাহেবের নিজের হাতের লেখা আর সই-করা একটা মন্তব্য আছে—ননসেন্স!

আবেদন-পত্রটি বীরবাঁধের ভদ্রসমাজের নিদারুণ এক দুশ্চিন্তার বিবৃতি। স্কুলের টীচার সুমিতা দত্তের চরিত্র খুবই শিথিল। এহেন এক স্ত্রীলোকের কাছে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বীরবাঁধের ভদ্র জনসমাজ দাবি করে যে, সুমিতা দত্তকে সরিয়ে দিয়ে কোন যোগ্য টীচার নিযুক্ত করা হোক।

আবেদন-পত্রে একগাদা স্বাক্ষরিত নাম গিজগিজ করছে। সবার আগে জিতেনবাবুর স্বাক্ষর, তারপর শ্যামবাবু, হরনাথবাবু, পার্বতীবাবুর স্বাক্ষর। অনেক অচেনা-আধচেনা মানুষের স্বাক্ষর, এমন কি বনেদী শঙ্করেরও স্বাক্ষর আছে।

দেখে চমকে ওঠে সুমিতা। জনার্দনদাও সই করে ফেলেছিলেন বুঝি? বোধহয় আবেদন-পত্রটা না পড়েই সই করেছিলেন। জনার্দনদার সইটা মোটা মোটা কালির দাগ দিয়ে কাটা। তার উপর আবার, যেন কলম দিয়ে খুঁচিয়ে আর কালির ছোপ দিয়ে সইটাকে ধেবড়ে দেবার চেষ্টাও হয়েছে। হতে পারে, আবেদনের ইংরেজী ভাষাটা ঠিক বুঝতে পারেননি জনার্দনদা। পরে যখন বুঝলেন যে···কিন্তু কী করে বুঝবেন জনার্দনদা, কেউ যদি তাঁকে বুঝিয়ে না দিয়ে থাকে?

একটা মাস নয়, পুরো তিনটে মাস পার হয়ে যায়, সুমিতা দত্তকে একটি নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার প্রসন্নতার মূর্তির মত স্কুলে গিয়ে সত্তর টাকা মাইনের চাকরি করতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জিতেন-

বাবুদের আবেদনের আশাটা তবু একটুও তেজ হারায় না। সুমিতাকে দেখে ওঁদের চোখের দৃষ্টিটা কুঁচকে গিয়েও দপ্ দপ্ করে আর জ্বলে। জিতেনবাবু বলেন—সময় লাগে, এসব আবেদনের সুফল ফলতে একটু সময় লাগে, শ্যামবাবু। শুনেছি, এই এডুকেশন অফিসার ডিসিসন নিতে বেশ দেরি করেন।

শ্যামবাবু—আপনার বড়মেয়েটি, যেটি বর্ধমানে পিসির বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে, কী যেন সেটির নাম?

—সুচেতা।

শ্যামবাবু—বোধহয় এই বছরেই বি-এ দেবে আপনার সুচেতা?

—না, আর না। তিন-তিনবার পরীক্ষা দিয়েছে, আর কত দেবে? সুচেতার পিসিও বলেছে, আর পরীক্ষা দিয়ে কোন লাভ নেই।

শ্যামবাবু—তাহলে সুচেতা এখন চলে এলেই তো পারে! পিসির কাছে আর পড়ে থেকেই বা লাভ কি?

—হ্যাঁ, আমিও তাই চাই। আমার বিশ্বাস, সুচেতা যদি এই স্কুলের টীচার হয়, তাহলে সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

শ্যামবাবু—নিশ্চয় নিশ্চয়!

—সেই জন্যেই চিঠি দিয়েছি সুচেতাকে, যেন আর দেরি না করে চলে আসে।

কিন্তু এই মাসেরই শেষের এক শুভ মঙ্গলবারে গিরিডির এক অভ্রওয়ালা মাড়োয়ারী যেদিন আদালতের পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে এসে জিতেনবাবুর বাড়ির দখল নিলেন, আর একটা দয়ার ব্যবস্থা হিসাবে জিতেনবাবুকে সেই বাড়িতে একটা বছর ভাড়াটে হয়ে থাকবার অনুমতি দিলেন, সেদিন দেনার দায়ে বিকিয়ে-যাওয়া বাড়ির বারান্দাতে বসে আর পথের দিকে দুটি ঘণ্টা তাকিয়ে থাকবার পর বর্ধমানের একটি চিঠি পেলেন জিতেনবাবু। চিঠি দিয়েছেন সুচেতারই পিসি, জিতেনবাবুর দিদি মৃণালিনী: সুচেতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কখন কবে কার সঙ্গে বিয়ে রেজিস্টারী করা হলো, জানি না। সে সব

ঘটনার কিছুই আমরা জানতে পারিনি। আমাদের কিছুই না জানিয়ে বরের সঙ্গে কলকাতা চলে গিয়েছে সুচেতা। একটা চিঠি অবশ্য লিখেছে সুচেতা, সুচেতা আর ওর বর শান্তনু ভালই আছে। শান্তনুকে চিনি, বর্ধমানেরই ছেলে, কলকাতাতে একটা কারখানার অফিসে খুব সামান্য মাইনের একটা কাজ করে।

চিঠি পড়ে নিয়ে, তারপর জোরে একটা হাই তুলে বারান্দার উপর এলিয়ে শুয়ে পড়েন জিতেনবাবু। দেখে মনে হতে পারে, ভদ্রলোকের শিরদাঁড়াটা ভেঙে গিয়েছে। ভদ্রলোক যেন অদ্ভুতভাবে কুঁকড়ে-যাওয়া একটা শরীর মাত্র, আর-কিছু নয়।

বড়দিনের সকালবেলা বেড়াতে বের হয়ে এহেন এক জিতেন-বাবুরই চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু ফণাতোলা সাপের মত ভঙ্গী নিয়ে একটা দৃশ্য দেখতে থাকে। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকে হৈ-হৈ করে নেচে লাফিয়ে আপেল আর কমলালেবু নিয়ে খাচ্ছে। স্কুলের দারোয়ান বললে, দশ ঝুড়ি ফল পাঠিয়েছে রেলওয়াই, স্কুলের ছেলে-মেয়েদের বড়দিনের আনন্দের জন্য।

এ কী ম্যাজিক? পঞ্চাশজন ভদ্রলোকের সই-করা আবেদনের পত্রটাকে মিথ্যে করে দিয়ে দশ ঝুড়ি ফল চলে আসে! ম্যাজিকও তো এরকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে দেখাতে পারে না।

আর, কে ওই লোকটা? ওই যে জনার্দনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ম্যাককেনা সাহেবের গালাকুঠির ফটক ছাড়িয়ে, কে জানে কোন্ দিকে বেড়াতে চলে যাচ্ছে? ওই লোকটাই না সেদিন জনার্দনের ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে আর আবেদনের চিঠিটা পড়ে চমকে উঠেছিল? ওরই আপত্তিতে মুহুরী জনার্দনটা ওর সই-করা নামটাকে কেটে-কুটে আর কালি ছিটিয়ে একেবারে ধেবড়ে দিয়েছিল। কে? কে?—ও শ্যামবাবু, কে এই লোকটা?

সত্যিই শ্যামবাবুকে ডাক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন জিতেনবাবু। তারপর শ্যামবাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে হন্-হন্ করে হাঁটতে থাকেন।

আট

মুহুরী মানুষ জনার্দন, মুকুটধারীবাবুর কাছারিতে পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করে। এ ছাড়া জনার্দনের অন্য কোন পরিচয় এই বীরবাঁধের দু'চারজন ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউই জানে না।

বাপের কালের মেটেবাড়ির একটি ঘরে জনার্দনের নিত্যপূজার একটি ছবি থাকে, সুদর্শনচক্রধারী কৃষ্ণের একটি ছবি। আর একটি ঘরে স্বয়ং জনার্দন মুহুরী থাকে। কিন্তু সেজন্য তার ওই মেটে-বাড়িটাকে একটা শূন্যতার বাড়ি বলে সে মনে করে না। বয়সটা যদিও ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়, তবু আজও জনার্দনের বিয়ে হয়নি। তার মানে বিয়ে করেনি জনার্দন। চাকরির দশ ঘণ্টা আর ঘুমের চারটি ঘণ্টা সময় বাদ দিলে জনার্দনের প্রাত্যহিক জীবনের বাকি দশ ঘণ্টা সময়ের প্রায় সবটাই ওই সুদর্শনচক্রধারীর ভজন-পূজন আর সেবার কাজে কেটে যায়। দিনের বেলা খিচুড়ি আর রাত্রিতে দুধ-খই-বাতাসা,' নারায়ণের এই ভোগের প্রসাদ ছাড়া জনার্দন ভুলেও কোন অবান্তর মিষ্টি কিংবা ফল মুখে দেয় না। জনার্দনই জানে, কী মন্ত্র বলে আর কী স্তব পাঠ করে সে এই ছবির ভজন-পূজন করে। মুকুটধারীবাবুকে শুধু কদিন মনের ভুলে বলে ফেলেছিল জনার্দন, স্বপ্নে দেখা দিয়ে সুদর্শনচক্রধারী নিজেই বলে দিয়েছেন, কী কথা বলে ভজন-পূজন করতে হবে। কী ভোগ দিতে হবে, সেটাও জনার্দনের স্বপ্নে শোনা একটা নির্দেশ।

এহেন জনার্দন, যাকে এই বীরবাঁধের কোন আনন্দের হল্লার মধ্যে, বলতে গেলে কোন কিছুর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না, সেই জনার্দন হেমন্তবাবুর বাড়িতে এসে, বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আর হেসে হেসে সুমিতার সঙ্গে কথা বলছে।

জনার্দন বলছে, সুমিতার যদি আপত্তি না থাকে, তবে তার ছেলেবেলার বন্ধু অনিমেষ সুমিতার সঙ্গে আর হেমন্তবাবুর সঙ্গে, বাড়ির সবারই সঙ্গে একবার দেখা করে চলে যাবে।

চমকে ওঠে সুমিতার শান্ত নিশ্বাসের বাতাসটা। দুই চোখ অপলক করে আর চুপ করে শুধু দেখতে থাকে, পেঁপে-বাগানের কাছে মাঠের ঘাসের উপর চড়ুইপাখির একটা দল হুটোপুটি করছে। হ্যাঁ বা না স্পষ্ট করে কথা বলবার অভ্যাসটা হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

জবাব দেবার কথা খুঁজতে গিয়ে সুমিতার এই হঠাৎ চমকে-ওঠা মনটা যেমন, মাথাটাও তেমনই অলস ও অবশ হয়ে ঝুঁকে পড়ে। জীবনে কোনদিনও সুমিতা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, কড়া-পড়া শক্ত মনটা কখনও এমন করে এত নরম হয়ে যেতে পারে, কিংবা যাবে।

সুমিতা বলে—আচ্ছা। আসতে বলবেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে আপনি একটু কথা বলে যান, জনার্দনদা।

জনার্দন—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

হেমন্তবাবুর কাছে এসে আর তেমনই হেসে হেসে কথা বলে জনার্দন।—আমার ছেলেবেলার যে বন্ধুটি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়, সে ছেলে বড় ভাল ছেলে। পনেরো বছর পরে আমার সঙ্গে দেখা, কিন্তু সেই পনেরো বছর আগের ছেলেমানুষটির মত আমার গলা জড়িয়ে ধরে কত গল্পই না করলে! আমার বন্ধু এই অনিমেষ সুমিতাকে চেনে।

সুমিতা—হ্যাঁ, মধুপুরের স্টেশনে দেখা হয়েছিল। আমার দরখাস্তটাকে উনিই হাতে নিয়ে চ্যাটার্জী সাহেবের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

হেমন্তবাবু—ছেলেটি চ্যাটার্জী সাহেবের কেউ হয় বোধহয়?

সুমিতা—জানি না।

জনার্দন—তা তো আমিও জানি না।

হেমন্তবাবু—বেশ তো, তোমার বন্ধু আমাদের এখানে এসে দেখা করে যাবে, ভালই হবে।

সুমিতা—কখন আসবেন উনি? আমি তো এখন স্কুলে যাব, ফিরব বিকেল চারটের পর।

জনার্দন—বিকেল হবার পর, এই ধর পাঁচটার সময় যদি আসে?

হেমন্তবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুক। আমাদের কোন অসুবিধা নেই।

জনার্দন চলে যেতেই বুঝতে পারে সুমিতা, স্কুলে যেতে আর দশ মিনিটও বাকি নেই।

তাড়াতাড়ি করে মাথার এপাশে-ওপাশে চিরুনিটাকে একবার বুলিয়ে নিয়ে স্কুলে যাবার জন্য তৈরী হতে গিয়েই চমকে ওঠে সুমিতা, এ কী? এ কী হলো? চোখ দুটো যে সত্যিই জলে ভরে গেল!

কে যেন ভয়ানক ঠাট্টা করে সুমিতাকে বলছে, শুনতে পাচ্ছে সুমিতার মনটা, কোথায় গেল সেই অহঙ্কার? অহঙ্কারটা যে জব্দ হয়ে আর গলে গিয়ে একেবারে চোখের জল হয়ে গিয়েছে!

ঠিকই, ঠাট্টার ধমকটা একটুও মিথ্যে কথা বলেনি। এ বাড়িতে এসে সুমিতার সঙ্গে দেখা করবার কোন সাধ্যিই হতো না ভদ্র-লোকের, শত ইচ্ছে আর চেষ্টা করলেও না। সুমিতারই ইচ্ছেটা সে ভদ্রলোককে এখানে আসবার পথ করে দিয়েছে।

না, আর দেরি করা সম্ভব নয়।

স্কুলে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। ভুল হয়েছে। এরকম আর কত ভুল হবে কে জানে! চেষ্টা করেও আজ আর পড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে না সুমিতা। উতলা মনটাকে শান্ত করতে পারা যাচ্ছে না।

পড়াতে পারে না সুমিতা। চুপ করে বসে থাকে। বাচ্চাদের দল খুশি হয়ে চেঁচামেচি আর ছুটোছুটি করে।

না, আর এভাবে চুপ করে বসে থাকতেও ভাল লাগে না। বিকেল চারটে হতে তখনও একটি ঘণ্টা বাকি।

অসময়ে ছুটি করিয়ে দিয়ে স্কুল থেকে যখন বাড়িতে ফিরে আসে সুমিতা, তখন সুমিতার উতলা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ভানুর চোখে যেন একটা নতুন খুশি উতলা হয়ে ওঠে।—আজ কে আসবে দিদি?

—জানি না।

রাণু—তুমি সাজবে না দিদি?

চমকে ওঠে সুমিতা। রাণুর গলায় মৃদু মিষ্টি আর নরম স্বরের এই প্রশ্নটা যেন একটা ঠাট্টার বাজের শব্দের মত কড় কড় করে বেজে উঠেছে। সুমিতার উতলা মনের চেহারাটাকেও পৃথিবীর সব চক্ষু কি এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে? আশ্চর্য নয়, পলাশ গাছটাও বোধহয় জিজ্ঞাসা করে ফেলবে, তুমি আজ সাজবে না?

রাণুর কথার জবাব না দিয়ে, ঘরের মেঝের উপর মাদুর পাতে সুমিতা, শুয়ে পড়ে। ব্যস্ত হয়ে উঠবার প্রাণটাকে যেন জোর করে ক্লান্ত করে দিতে চায়। কিংবা ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নের ভিতরে একটা সাহস খুঁজে পেতে চায়, যেন ভদ্রলোককে এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পারে সুমিতা, বার বার শতবার বীরবাঁধে এসে দেখা করবার এরকম হাজার উৎসাহ দেখালেও আপনার কোন লাভ হবে না, কিন্তু আমার ক্ষতি হবে।

কী আশা করে ভদ্রলোক এখানে আসছেন? বুঝতে পারছেন না যে, এলেও শুধু দেখা করেই চলে যেতে হবে? জানেন না ভদ্র-লোক, সুমিতার প্রাণ কোন উৎসবের শাঁখের শব্দ শুনতে চায় না। কারণ, উপায় নেই সুমিতার। পঙ্গু বাবা আর দুটি ছোট ভাই-বোনের অসহায় ভাগ্যকে এখানে ফেলে রেখে সুমিতার পক্ষে একা একটা নতুন ভাগ্যের ঘরে চলে যাবার সাধ্যি নেই।

কিন্তু, ছি ছি। এত নির্লজ্জ হয়ে মনটা এসব কথা এখনই ভাবতে

শুরু করেছে কেন? ঝড়ের আগে উড়ে-যাওয়া পাতাটার মত এরকম অদ্ভুত ভাবনার কোন মানে হয় না। ভদ্রলোক হয়তো শুধু মধুপুরের সেই রাত্রির ভয়ানক বৃষ্টির কথা তুলে, সেই সঙ্গে বীরবাঁধের পলাশ আর শিরীষের দু'চারটে প্রশংসার কথা বলে দিয়ে চলে যাবেন। কিংবা হয়তো শুধু একটু দেখে যেতে চান, মাইনে বাড়াবার জন্য দরখাস্ত হাতে নিয়ে যে-মেয়ে এডুকেশন অফিসারের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, সে-মেয়ের নিজের ঘরোয়া জীবনের চেহারাটা কেমন? •

—সুমিতা! ডাক শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে সুমিতা। বুঝতে তো অসুবিধে নেই, আর কেউ নয়, জনার্দনদা এসে পড়েছেন আর ডাক দিয়েছেন।

ঘরের বাইরে এসেই দেখে খুশি হয় সুমিতা, রাণু আর ভানুর বুদ্ধি আছে, বারান্দাতে দুটো চেয়ার নিশ্চয় ওরাই এনে রেখে দিয়েছে। একটি চেয়ারে বসে আছেন সেই ভদ্রলোক, যাঁর নাম অনিমেষ। আর জনার্দনদা চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুমিতা—বসুন, জনার্দনদা!

জনার্দন—আমি তো চেয়ারে বসি না, সুমিতা।

অনিমেষের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে সুমিতা।—আপনার বন্ধু জনার্দনদার ধারণা, চেয়ারে বসলে মানুষের মনে অহঙ্কার হয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অনিমেষ। হাসতে থাকে।—জনার্দন ঠিক ধারণাই করেছে।

সুমিতা—না না, আপনি বসুন।

অনিমেষ—আপনার বাবা কোথায়?

সুমিতা—শুয়ে আছেন।

অনিমেষ—ঘুমিয়ে আছেন?

সুমিতা—হ্যাঁ।

অনিমেষ—তবে তাঁকে এখন আর ডেকে ওঠাবেন না—আমি বরং ততক্ষণ···এরা নিশ্চয় আপনার ভাই আর বোন?

সুমিতা—হ্যাঁ, ভানু আর রাণু।

অনিমেষ—আমি ততক্ষণ ভানু আর রাণুর সঙ্গে আপনাদের পেঁপে-বাগানটা দেখে আসি।

ভানু বলে—কুলগাছ আছে, কামরাঙা গাছও আছে।

অনিমেষ—তবে আর দেরি নয়, চল, শিগ্‌গীর দেখে আসি।

রাণু আর ভানুকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োতলার কাছে, পেঁপে-বাগানের কাছে ঘুরে বেড়ায় অনিমেষ। কুমড়ো-মাচার কাছে থমকে দাঁড়ায় আর কী-যেন দেখতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে ভানু—গুনবেন না, গুনবেন না, গুনবেন না! শুধু দেখে নিন, পাঁচটে কুমড়ো ফলেছে।

সুমিতার মুখের চাপা-হাসিটা হয়তো শব্দ করে বেজে উঠতো, হেমন্তবাবু যদি হঠাৎ বাইরে এসে না দাঁড়াতেন।

জনার্দন—আপনি বসুন, কাকা। অনিমেষ এসেছে।

হেমন্তবাবু—কোথায় এসেছে?

জনার্দন—ওই যে, রাণু আর ভানুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হেসে ফেলেন হেমন্তবাবু।—বাঃ, বেশ সরল হাসি-খুশি স্বভাবের ছেলে বলে মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ, কাকা। পনেরো বছর আগে ওকে যেমনটি দেখেছিলাম, ও যেন এখনও তাই। পরিবর্তন এই যে, তখন আমাকে দেখতে পেলেই কুস্তির প্যাঁচ মেরে আমাকে অনর্থক আছড়ে দিত, এখন আর দেয় না।

—কী করে ছেলেটি?

—চাকরি করে।

—কোথায়?

—আসানসোলে।

জানে সুমিতা, এডুকেশন অফিসার চ্যাটার্জী সাহেবের স্থায়ী অফিসটা আসানসোলেই। স্কুলের দরকারের কোন চিঠি পাঠাতে হলে আসানসোলের অফিসে পাঠাতে হয়। বুঝতে অসুবিধে নেই,

জনার্দনদার এই বন্ধু মানুষটি চ্যাটার্জী সাহেবের অফিসের ঘরে কোন কাজ করেন। কিন্তু···

সুমিতার মনের ভিতরে যে কৌতূহলের প্রশ্নটা ছটফট করে ওঠে, ছিঃ, সেটা যে ভয়ানক একটা হিসেবী বুদ্ধির কৌতূহল। প্রিয় জেঠামশাই বলেন, কোন মানুষকে তার জাতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে নেই। করলে, মানুষটাকে অপমান করা হয়। ওটা ছোট মনের জিজ্ঞাসা। কিন্তু চাকরির পরিচয় জিজ্ঞাসা করাও কিএকটা ছোট মনের জিজ্ঞাসা নয়?

দিল্লীর আর কাশীর গল্প বলেছেন প্রিয় জেঠামশাই দিল্লীতে অচেনা ভদ্রলোকের চাকরির পরিচয়টা আগে জেনে না নিয়ে কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন না। আর কাশীতে কোন আগন্তুক অচেনা মানুষ বাড়িতে এলে তাঁর জাতের পরিচয় আগে না জেনে নিয়ে কেউ তাকে বসতে বলে না। তার চেয়ে আরও ভয়ানক হিসেবের কথা বলতো হোস্টেলের মালতীদির মেয়ে শুভাননা—আমি আগে জেনে নেব, অন্তত সাতশো টাকা মাইনের কোন চাকরি করে কিনা ভদ্রলোক। তারপর···

জয়া আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তারপর কী?

শুভাননা—তারপর আর কী? সাতশো টাকা মাইনের মানুষ হলে তার সঙ্গে ভালবাসাবাসি হবে, কম হলে ওসব কিছুই হবে না।

জয়া—কী করে ভালবাসাবাসি হবে? তুমি ইচ্ছে করলেই হবে?

মাথা দুলিয়ে হেসে ফেলেছিল শুভাননা—শুধু ইচ্ছে করলেই হবে না, চেষ্টা করতে হবে। সেটা একটা আর্ট।

শুভাননার মত আর্টিস্ট হতে হলে আরও আগে, অনেকদিন আগেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু···দূর ছাই, শুভাননার মুখের কথা, প্রায় চার বছর আগে শোনা একটা পুরনো কথার ভুল ধরবার

জন্য সুমিতার চিন্তাটা আজ ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেন? অনিমেষের চাকরিটা সাঁইত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি হোক বা সাতশো টাকা মাইনের চাকরি হোক, তাতে সুমিতার কিছুই আসে যায় না।

কিন্তু জোর করে মনের সেই অদ্ভুত ভয়টাকে সরিয়ে দিতে গিয়ে সুমিতার মনটা যেন দেখতে পাচ্ছে, হেসে ফেলছে সেই অদ্ভুত ভয়। লজ্জা পেয়ে মুষড়ে পড়ে সুমিতার এইসব শক্ত-শক্ত চিন্তার সাহস। নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা বস্তুটা তো লুকানো বস্তু নয়। অনিমেষ নামে ওই ভদ্রলোকের জীবনের কোন খবর না জেনেও সুমিতার মনে ভদ্রলোকের জন্য সন্ধ্যাকাশের তারার মত ছোট একটা মায়ার তারা ফুটে উঠেছে। ইচ্ছে করে আর চেষ্টা করে সুমিতাকে এভাবে দেখতে এসে যদি বুঝতে পারে অনিমেষ যে, বীরবাঁধের মেয়ে সুমিতার কাছ থেকে তার আশা আলোকিত করবার মত কোন আলো নেই, আর এই বিফলতার লজ্জায় লজ্জিত হয়ে চলে যায়, তবু অনিমেষের উপর রাগ বা অভিমানের কোন ছায়াও সুমিতার প্রাণে দেখা দেবে না। সুমিতা চাইবে, অনিমেষ যেন তার মনের মত ও আশার মত কোন আলোর ছবিকে কোথাও পায়।

অনেকক্ষণ আনমনা ভাবনার মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল সুমিতা, তাই শুনতে পায়নি, জনার্দনদার মুখের কী কথা শুনে বাবা এত খুশি হয়ে হাসছেন। বোধহয় অনিমেষের নামে অনেক অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছেন জনার্দনদা।

হেমন্তবাবু বলছেন—আমি অবশ্য কোনদিন কাঞ্চননগর যাইনি, যদিও ওদিকের প্রায় সব জায়গাতে গিয়েছি।

জনার্দন—অনিমেষের বাবা জয় মিত্তির ঘোড়ায় চড়ে ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়ে ছুটে চলে যেতেন। আমি যখন তাঁকে নিজের চোখে দেখেছিলাম, তখন আমার বয়স চোদ্দ কিংবা পনেরো!

হেমন্তবাবু—অনিমেষও বোধ হয় ··

জনার্দন—না, কাকা। সেই জমিদারীর দিন তো এখন আর নেই। অনিমেষকে আর ঘোড়া-টোড়া চড়ে ছুটোছুটি করতে হয় না। বেচারা এখন ফাইল হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করে।

অনিমেষ এসে হেমন্তবাবুর কাছে দাঁড়ায়। নমস্কার করে আর রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

অনিমেষ—আমি এই নিয়ে তিনবার আপনাদের বীরবাঁধে এসে জনার্দনকে খুব বিরক্ত করেছি। আজ আপনাদেরও বিরক্ত করে গেলাম।

হেমন্তবাবু বলেন—তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। তোমার নামে জনার্দন যে-সব গল্প বলল, তা শুনে আরও খুশি হয়েছি।

সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে অনিমেষ—আপনি বোধহয় ভাবছেন যে, লোকটা গায়ে পড়ে দেখা করতে এসেছে কেন?

হেসে ফেলে সুমিতা—তা একটু ভেবেছি বৈকি!

অনিমেষ—ভেবেও বোধহয় কোন কুল-কিনারা পাননি?

সুমিতা—না।

অনিমেষ ডাকে—কই? ভানু কোথায় গেল?

—এই যে আমি! এগিয়ে আসে ভানু।

অনিমেষ—দেখি ভানু, তোমার পাঞ্জার জোর কেমন?

ভানুর কচি হাতের পাঞ্জার সঙ্গে পাঞ্জা মিলিয়ে দিয়ে এইবার সুমিতার দিকে তাকায় অনিমেষ।—সুমিতা যদি ওসব কথা না ভেবে বরং একটু ভেবে দেখতে চেষ্টা করে যে, রক্তকরবীর এমন চমৎকার গাছটাতে ফুল ধরছে না কেন, তবে ভাল হয়।

হেমন্তবাবু—ভেবেছে ভেবেছে। অনেক ভেবেছে সুমিতা। গাছের গোড়াতে গোবরসার দিয়েছে, পচাপাতার সার ও ভাতের ফ্যানও দিয়েছে। কিন্তু কই? এখনও তো···

জনার্দন—ভুল হয়েছে। রেড়ির খোলের সার দিলে কাজ হতো।

উঠে দাঁড়ায় অনিমেষ—আমরা এখন চলি।

হেমন্তবাবু—এস, এস।

রাণু ও ভানু একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে—আবার কবে আসবেন?

অনিমেষ হাসে—দেখি!

সুমিতার হঠাৎ-গম্ভীর মুখটা হঠাৎ লালচে হয়ে যায়। কিন্তু ঠোঁট দুটোকে যেন শক্ত করে চেপে রাখে সুমিতা। কোন কথাই বলে না।

অনিমেষ বলে—আমি আবার একদিন আসবো, ভানু। তোমার দিদি আসতে বলুক বা না বলুক, আমি আসবো।

নয়

এই বীরবাঁধে সত্যিই একটা বাঁধ ছিল, সে বাঁধের কোন চিহ্ন এখন আর নেই। মুকুটধারীবাবু অনেক দূরের ধানক্ষেতের উত্তর দিকের কয়েকটা উঁচু ঢিবিকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন, ওইখানে ছিল সেই বাঁধ। বীর নামে এক গেঁয়ো রাজা ওই বাঁধ তৈরী করেছিলেন। বর্ষাকালে পাহাড় থেকে জলের ঢল গড়িয়ে এসে ওই বাঁধে জমা হতো। মিউটিনির সময় সেই বীর রাজা তাঁর এগারোটি ছেলেকে আর এক হাজার জংলী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাঁধের কাছে কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে লড়াই করেছিল।

একালের বীরবাঁধের জীবনে দেখা যায় এগারোটি ছেলে নয়, তিন-এগারো তেত্রিশেরও বেশি ছেলে বীরবাঁধের পথে-মাঠে ও স্টেশন ঘুরে বেড়ায়। ওরা বীরবাঁধের ঘরের ছেলে হলেও বাইরে থেকে বেড়াতে আসা মানুষের মত বছরের প্রত্যেকটি ছুটির ঋতুতে বাইরে থেকে বীরবাঁধে আসে আর থাকে।

পাটনা মুঙ্গের মধুপুর আর কলকাতার স্কুল-কলেজ ছুটিতে যখন বন্ধ হয়, তখন ওরা বীরবাঁধে আসে। বীরবাঁধের বাতাস ওদের উৎসাহ উল্লাস আর চঞ্চলতায় নতুন করে শিহরিত হয়।

চেহারায়, সাজে-পোশাকে ও হাসাহাসিতে এরা কেউ ঠিক বনেদী শহুরের মত নয়। বড় জুলপি, বড় চুল আর সরু গা-সাঁটানো প্যাণ্ট; এদের কেউ-কেউ আমবাগানের ছায়াতে জড়ো হয়ে নতুন সুরের গান গায়। কেউ বা নতুন রকমের অষ্টাবক্র ভঙ্গীর বিলিতী নাচ নাচে বীরবাঁধের স্টেশনে এদের ভিড় আনাগোনা লেগেই থাকে, কারণ সিনেমার ছবি দেখা এদের প্রাত্যহিক জীবনের একটা আত্যন্তিক প্রয়োজনের কাজ। তাই মধুপুরে একবার যেতেই হয়। এবং ফিরে আসতে বেশ রাতও-হয়।

শ্যামবাবু তাই রাস্তার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন, তাঁর বিপিন কখন আসবে? জিতেনবাবুর স্ত্রী শান্তিলতা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁর জয়ন্ত কখন আসবে?

এদিকে হরনাথ-বিধুময়ীর মেয়ে অঞ্জলি চেঁচিয়ে ওঠে।—আমি আর গালাকুঠির রাস্তাতে কোনদিনও বেড়াতে যাবো না।

বিধুময়ী—কেন রে?

অঞ্জলি—বিপিনদা আর জয়ন্তদা হঠাৎ হুট্ করে কোত্থেকে ছুটে এসে আমার সাইকেল চেপে ধরে।

হরনাথ—কী বললি?

অঞ্জলি—আমার ভয়ানক ভয় করে। আমি আর এখানে থাকবো না। আমি কানপুরে মামাকে চিঠি লিখে দিয়েছি। আমি কানপুরে থাকবো।

সাইকেল-চড়া অঞ্জলি যেদিন গির্জাপাড়ার রাস্তাতে জয়ন্ত আর বিপিনের তিন-রঙা সাজের দুই চেহারাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, আর বাড়ির দরজার কাছে এসে একটা আছাড় খেয়ে পড়ে গেল, সেদিন তেবড়ে-যাওয়া সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে কেঁদেই ফেলল অঞ্জলি।—আমি আজ একাই কানপুরে চলে যাবো।

সত্যি, সেদিনই কানপুরের মামা নন্দবাবু বীরবাঁধে এসে পড়লেন, আর, হরনাথ ও বিধুময়ীকে অনেক গালিগালাজ করলেন। বিধুময়ী বললেন—ঘরের শত্রু এই বিভিষণী মেয়ে আপনার কাছে চিঠিতে নিশ্চয় অনেক মিথ্যে কথা লিখেছে। তাই আপনি মিথ্যে রাগ করে···

নন্দবাবু—কোন কথা শুনতে চাই না।

অঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে কানপুর চলে গেলেন নন্দবাবু। তেবড়ে-যাওয়া সাইকেলটা হরনাথের বাড়ির একটা গাছের কাছে ধুলোমাখা হয়ে পড়ে রইল।

পঞ্চাশ বছর আগের বীরবাঁধে পঁচিশ বছর বয়সের যাঁরা ছিলেন, যাঁরা বছরে অন্তত একটিবার বেলুড় আর দক্ষিণেশ্বরে না গিয়ে পারতেন না, তাঁরা সকলে মিলে পাঁচশো টাকা খরচ করে সড়কের তেমাথার কাছে একটি পাকা ঘর তুলেছিলেন। সে ঘরের নাম, চিন্তামণি। আরও পাঁচশো টাকা খরচ করে বাংলা হিন্দী সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার অনেক বই কিনে চিন্তামণির চার দেয়ালের তাকের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিলেন। চিন্তামণির দরজার তালা খুলে আর ভিতরে ঢুকে যাঁরা ধুলো-মাখা বইগুলিকে একটু ঝাড়া-মোছা করেন, তাঁরা হলেন প্রিয়নাথবাবুর মত ষাট বছর বয়সের দু-চার জন। হ্যাঁ, ছুটির ঋতুতে অবশ্য দেখা যায়, দু-চারজন পঁচিশ বছর বয়সের মানুষও চিন্তামণিতে এসে ধুলো-মাখা বইগুলিকে একটু আদর-যত্ন করে। প্রিয়নাথবাবুর ভাইপো হিমাংশু আর করাতকলের পরেশবাবুর দুই ছেলে, যাদব ও মাধব। জিতেনবাবু কিন্তু এই তিনজনেরই সম্পর্কে তাঁর একটা হতাশার কথা বলে থাকেন।—কী অদ্ভুত তিনটে অকালবৃদ্ধ প্রাণ। এরা কী নিয়ে আর কিসের জোরে জীবনের সংগ্রামে ফাইট করবে, বলুন তো শ্যামবাবু ?

বীরবাঁধের এইসব এরা আর ওরা, যারা পূজার ছুটিতে বীরবাঁধে এসে এদিকে-সেদিকে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে, তাদের কেউই জিতেনবাবুর অচেনা জন নয়। কিন্তু কে ওই লোকটা, জনার্দনের মত বয়সের একটা ধাড়ি ইয়ংম্যান, রোজই সকাল-সন্ধ্যা হেমন্তবাবুর বাড়িতে গিয়ে বারান্দাতে বসে হাসে আর গল্প করে ?

শ্যামবাবু বলেন—আমিও ভেবে আশ্চর্য বোধ করছি। কে এই লোকটা, হেমন্তবাবুর কোন্ এমন সহোদর কুটুমের ছেলে, যার সঙ্গে পলাশতলায় দাঁড়িয়ে গল্প করে ওই ধাড়ি মেয়ে সুমিতা ?

হরনাথ বলেন—খোঁজ নিয়েছি। লোকটা হলো জনার্দনের ছেলে-বেলার বন্ধু। আসানসোলে চাকরি করে।

জিতেনবাবু—কিসের চাকরি ?

হরনাথ—গবেট জনার্দন বললে, সে কিছু জানে না, বঙ্কুও তাকে কিছু বলেনি।

শ্যামবাবু—শুনেছি, গবেট জনার্দন মিথ্যে কথা বলে না।

জিতেনবাবু—গবেট জনার্দনকে জিজ্ঞেস করে আরও কিছু সত্য কথা কিন্তু জেনে নেওয়া উচিত, শ্যামবাবু।

হরনাথ হেসে ফেলেন।—কিছু সত্য কথার একটা দৃশ্য আমি নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছি।

শ্যামবাবু—তার মানে?

হরনাথ—তার মানে এই যে, ঠিক জনার্দনের মত ভিজে গামছা পরে খিচুড়ি রাঁধতে পারে লোকটা, নাম হলো অনিমেষ। বঙ্কু যেন বঙ্কুরই প্রতিচ্ছবি। শিলের উপর নোড়া দিয়ে হলুদ পিষতে গিয়ে গবেট জনার্দন যেমন করে মাথা দোলায়, এই অনিমেষ লোকটাও, কী আশ্চর্য, ঠিক তেমনই করে মাথা দুলিয়ে হলুদ পিষতে পারে। নিজের চোখে দেখেছি।

জিতেনবাবু—এটা হলো জনার্দনের মত শুদ্ধাচারের শাসন। জনার্দনের ঘরে থাকতে হলে ওটা না করে উপায় নেই। কথায় আছে না, রোমে থাকতে হলে রোমানদের মত থাকতে হবে।

হরনাথ—সেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু রান্না-টান্না করবার এত নিখুঁত অভ্যাসটি কি এক-দুদিনের চেষ্টাতে হতে পারে?

শ্যামবাবু—মনে হচ্ছে, লোকটা রান্নাবান্নার চাকরি করে।

জিতেনবাবু—তা মনে হয় না। কারণ, ইংরেজী পড়ে বুঝতে পারে। মনে নেই, সেদিন এই লোকটাই জনার্দনের হাত থেকে সেই আবেদনের পত্রটা কেড়ে নিয়ে আর পড়ে নিয়ে···

শ্যামবাবু—খুব মনে আছে। এই লোকটাই তো জনার্দনের কানে কানে কী যেন বলে দিল, আর জনার্দনও অমনি হাঁউমাঁউ করে লাফিয়ে উঠে ওর সইটাকে কেটে দিল।

জিতেনবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইদিনই তো প্রথম আভাস পাওয়া গেল,

হেমন্তবাবুর বাড়ি মেয়ের সঙ্গে ব্যক্তিটির বেশ একটু সহানুভূতির সম্পর্ক আছে।

হরনাথ—আমি কিন্তু একদিন একফাঁকে, যখন জনার্দন ঘরে ছিল না, তখন ওই অনিমেষকেই কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করে এসেছি।

শ্যামবাবু—অ্যাঁ? তাই নাকি! সত্যি, আপনার এনার্জির প্রশংসা করতে হয়!

হরনাথ—জিজ্ঞাসা করলাম, মশাইয়ের চাকরিটা নিশ্চয় একটা শিক্ষিত চাকরি?

জবাব দিল: হ্যাঁ, তাই বটে।

জিতেনবাবু—অ্যাঁ? এ যে থতমত খাওয়া একটা তোতলামি!

হরনাথ—হ্যাঁ। আমার জেরায় পড়ে শেষে প্রায় স্বীকার করে ফেললে। বললে: জনার্দনের চাকরিটা যদি শিক্ষিত চাকরি হয়, তবে আমার চাকরিটাও শিক্ষিত চাকরি। আমি বললাম: জনার্দন তো মুহুরিগিরি করে। লোকটা বললে: আমি ইয়েগিরি করি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: একটু স্পষ্ট করেই বলুন না মশাই। শুনে সুখী হই। লোকটা বললে: যা খুশি একটা অনুমান করে ফেলুন না মশাই। আমি বললাম: অনুমান করছি, অফিসের বেয়ারা কিংবা আর্দালির চাকরি। লোকটা তখুনি একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে আর শুকনো হাসি হেসে বলেই ফেললে: তাই।

—তাই বলুন, তাই বলুন! শ্যামবাবু আর জিতেনবাবু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেই হেসে ফেলেন।

হরনাথ—চলুন মশাই, এখনই বের হয়ে পড়ি।

শ্যামবাবু—কোথায়?

হরনাথ—একটু প্রাণ খুলে বেড়াতে ইচ্ছে করছে।

জিতেনবাবু—আমারও ইচ্ছে করছে।

বেড়াতে বেড়াতে, রেল-লাইনের পাশের সরু মেঠো রাস্তাটা ধরে দেড় মাইল দূরের ট্যানারি বাড়ির গেট পর্যন্ত দুজনে চলে যান।

ঘাসের চোরকাঁটাতে ধুতির কোঁচা ভরে যায়। তবু সেদিকে কারও সামান্য একটু ভ্রূক্ষেপও নেই। এরকম প্রসন্ন হয়ে বেড়াবার সুযোগ তাঁরা অন্তত এই তিন বছরের মধ্যে কখনও পাননি। বেড়িয়ে এত প্রসন্নও কোনদিন হতে পারেননি।

জিতেনবাবু বলেন—আর্দালি হোক বা বেয়ারা হোক, মানুষ তো বটে।

হরনাথ—নিশ্চয়। খুব ভাল হলো। হেমন্তের মতো মানুষের মেয়ের পক্ষে এটা তো একটা সৌভাগ্য।

দশ

সুমিতা হাসে।—ভুল যখন করেই ফেলেছি, তখন আর উপায় কি ? এ ভুল তো শোধরানো যায় না।

অনিমেষ—কেন ভুল করলে ?

সুমিতা—জানি না। ভুলটা হঠাৎ হয়ে গেল। কোনদিনও ধারণা করতে পারিনি যে, আমার কোনদিনও এরকমের ভুল হবে, কিংবা হতে পারে।

অনিমেষ—ভুল আবার কী হলো ? কিসের ভুল ?

একজন অচেনা মানুষের সঙ্গে পলাশতলাতে দাঁড়িয়ে এরকমের একদিন কথা বলতে হবে, এটা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি।

অনিমেষ—এখনও অচেনা ?

সুমিতা—না। কিন্তু আর বেশি চিনতে চাই না। আর চেনবার কোন দরকারও নেই। এখন বরং তুমি আমাকে আরও একটু চিনতে চেষ্টা কর।

অনিমেষ—কোন দরকার নেই। খুব চেনা হয়ে গিয়েছে। উঃ !

সুমিতা দুই ভুরু টান করে হাসে।—কী হলো ?

অনিমেষ—সত্যি, গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কী ভয়ই যে করেছিল, বলে বোঝাতে পারবো না।

সুমিতা—বেশ মজার ভয়। দিব্যি হুট্ করে হাজির হলেন, কুয়োতলাতে দৌড়াদৌড়ি করলেন। এটা ভয়ের লক্ষণ ?

অনিমেষ—ভয় চেপে রাখতে চেষ্টা করবার লক্ষণ।

হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে কথা বলে সুমিতা—কিন্তু আমাকে বিয়ে করলে তুমি কী করে সুখী হবে, বুঝতে পারছি না। আমি তো এবাড়ির ঘর ছেড়ে তোমার ঘরে গিয়ে থাকতে পারবো না। কাজ

করতে অক্ষম রোগী মানুষ বাবাকে কে দেখবে? ভাই আর বোনটাকে দেখবে কে? আমি পাগল হয়ে গেলেও তো এদের ছেড়ে যেতে পারবো না।

অনিমেষ—কিন্তু আমারও তো বাপ-মা ভাই-বোন আছে সুমিতা। আমি তাদের ছেড়ে দিলে তাদের দেখবে কে? আমি কি তাদের ছেড়ে দিয়ে তোমার বাড়িতে তোমার কাছে থাকবো? সেটা কি উচিত হবে? তুমি কি তাই চাও?

সুমিতা—কক্ষণো না। আমার জন্য তুমি তোমার বাপ-মা আর ঘর ছাড়লে আমারও পাপ হবে।

অনিমেষ—তাহলে বল, ভালবেসেও আমরা কেউ কারও আপন হতে পারলাম না।

মাথা হেঁট করে আর নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিতা। অনিমেষ বলে—তাহলে বল, আমি তোমাকে শুধু আমার চোখের কাছে পেলাম, বুকের কাছে পেলাম না।

চোখ মুছে নিয়ে প্রশ্ন করে সুমিতা—তুমিই বল, কী হলে কী হতে পারে?

অনিমেষ—বিয়ে হোক। বিয়ে হতে তো কোন বাধা নেই, অসুবিধে নেই।

সুমিতা—তারপর?

অনিমেষ—তারপর যা হবার তাই হবে।

সুমিতা—তারপর তুমি এইরকমই এখানে আমার কাছে আসবে আর চলে যাবে?

অনিমেষ—হ্যাঁ। তুমিও আমার কাছে যাবে আর চলে আসবে। পৃথিবীতে কোন স্বামী-স্ত্রী দুজনে কি দুজায়গাতে থেকে চাকরি করে না?

এইবার আঁচল তুলে দুই চোখ চাপা দেয় সুমিতা। কে জানে পৃথিবীর কোন্ স্বামী-স্ত্রী এভাবে থাকে! তাদের ভালবাসার প্রাণ

সুমিতার মত কেঁদে ওঠে কিনা, কে জানে! যার হাত ধরে সারা জীবন শিরীষ-পলাশের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে, তারই সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হবে। সুমিতার ভালবাসার ভাগ্যটার মধ্যেও কী অদ্ভুত একটা ঠাট্টা লুকিয়েছিল।

সুমিতা—যদি বিয়ে না হয়, তবে তোমার কি খুব দুঃখ হবে?

অনিমেষ—খুব দুঃখ হবে সুমিতা। শুধু একজন চেনা মানুষের মত আমি শুধু তোমাকে দেখা দিতে আসবো আর চলে যাবো, এটা আমার জীবনে শাস্তি হবে না, শাস্তিই হবে।

সুমিতা—তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই।

অনিমেষ হাসে—আমার আরও একটু বলবার আছে।

সুমিতা—না। আর বলবার কিছু থাকতে পারে না। অনেক বলে নিয়েছ।

অনিমেষ বললে—তুমি বিশ্বাস করবে কি, মধুপুরে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হবার আগে থেকেই তুমি আমার চেনা?

সুমিতা—কেমন করে? স্বপ্নে দেখেছিলে বুঝি?

অনিমেষ—হ্যাঁ, স্বপ্নেরই মত একটা ব্যাপার।

সুমিতা—অসম্ভব।

অনিমেষ—খুব সম্ভব। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায় সুমিতা। সুমিতারও প্রাণের ভিতরে বসে একটা স্বপ্ন যেন সুমিতার মুখের কথার এইসব সুখী উচ্ছ্বাস কেড়ে নিয়ে চুপ করিয়ে দিতে চাইছে।

অনিমেষ—কী ভাবছ?

সুমিতা—তোমার ওসব স্বপ্নের গল্প আর শুনবো না। অনেক বলেছ, আমিও অনেক শুনেছি। ভালবাসলে বেশি কথা বলবার দরকার হয় না।

অনিমেষ—তার মানে?

স্থমিতা—তার মানে, খুব বেশি কথা না বলেও ভালবাসাতে পারা যায়।

অনিমেষ—বুঝলাম, আর ঠাট্টা করো না।…না, ওসব কথা নয়। আমি শুধু বলছি, আর দেরি না করে এ মাসেই কোন একটি দিনে বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হয়।

স্থমিতা হেসে ফেলে—তুমি যদি মনে কর ভাল হয়, তবে ভালই হয়।

অনিমেষ—আমি তাহলে আজই চলে যাই!

স্থমিতা—আজই?

অনিমেষ—হ্যাঁ, আর দেরি না করে বাবা আর মাকে খবরটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল।

স্থমিতা—ভাবতে আমার বেশ ভয় করছে।

অনিমেষ—আবার কিসের ভয়?

স্থমিতা—তোমার বাবা-মা, তোমার ভাই-বোন আমাকে দেখে সবাই কি খুশি হতে পারবে?

অনিমেষ—আমি বলছি, বিশ্বাস কর, সবাই খুশি হবে।

স্থমিতা—তাহলে…

অনিমেষ—তাহলে এখন তোমাকে আর তোমাদের কাউকেই কিছু ভাবতে হবে না। সে জন্য জনার্দন আছে।

অনিমেষের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে সড়কের উপর উঠেই থমকে দাঁড়ায় স্থমিতা—এস।

চলে যায় অনিমেষ।

সেই মুহূর্তে, মহাবীরের দোকানের কাছে, সড়কের ধারে জোড়া-শিমুলের তিনটি মোটা ডালের মোটা ছায়াতে দাঁড়িয়ে তিন পথিকের গলা তিনরকম স্বরে কেশে ওঠে।

জিতেনবাবু বলেন—সী অফ্ করছে।

শ্যামবাবু—ছেলেটার আকৃতিটা মন্দ নয়, কিন্তু প্রকৃতিটা কেমন?

হরনাথ—সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না বটে, কিন্তু অবস্থাটা বুঝতে পারা গিয়েছে।

জিতেনবাবু—কিন্তু এটাও তো বুঝতে হবে যে, সুমিতার মত দীনহীন অবস্থার মেয়ের সঙ্গে এইরকম দীনহীন অবস্থার ছেলেকেই মানায়।

শ্যামবাবু—কিন্তু পরিণামটাও কি ভাল মানাবে? মেয়েটা চাকরি ছাড়বে না, অগত্যা ওই ছেলেটা ঘর-জামাই হবে, কিংবা মাঝে মাঝে এসে দাম্পত্য রক্ষা করে যাবে ; পাঁচ বছরে হয়তো চারটে ছেলে-পুলে হয়ে যাবে। তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ?

হরনাথ—সেটা আর আপনি ভেবে কী করবেন ? ভাগ্যে যা লেখা আছে, তাই তো হবে।

জিতেনবাবু—ভাগ্যে সব কিছু লেখা থাকে না মশাই। নিজের দোষগুণে ভাগ্যটারও দোষগুণ হয়। বেশি উপর দিকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটলে খানায় পড়ে যেতে হয়। হেমন্তবাবুর মেয়েকে সেইরকমই পড়ে যেতে হয়েছে।

হরনাথ—ফেঁসেও গিয়েছে বোধহয়।

শ্যামবাবু—আমারও সেইরকম একটা সন্দেহ মনে যে দেখা দেয় নি, তা নয়। ওদের দেখা-শোনার কাণ্ডটা তো প্রায় চার মাস হলো চলছে।

জিতেনবাবু—ধরুন তিন মাস, কিংবা তিনটে দিন, তাতেই বা ফেঁসে যেতে অসুবিধে কিসের ?

হরনাথ—যা-ই হোক। শেষ পর্যন্ত যা হলো, সেটা ভালই হলো।

শ্যামবাবু—হেঁ হেঁ হেঁ! সে আর বলতে! অহঙ্কারের পতন না হয়ে পারে না, মশাই। আর, অতিবাড় বাড়লে ছাগলে মুড়ে খায়।

এগারো

হ্যাঁ, জনার্দন আছে। জনার্দনই ব্যস্ত হয়ে আসা-যাওয়া করছে। কিন্তু খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মত কাজ তো নয়। পলাশতলার কাছে শালুর কাপড় আর বাঁখারি দিয়ে একটা তোরণ তৈরী করে রাখা। আর, পুরোহিত গোপাল ভটচাযের কাছে গিয়ে অনুষ্ঠানের ও যজ্ঞের জিনিসগুলির ফর্দ নিয়ে আসা ও কিনে রাখা; কাজগুলো সেরে রেখেছে জনার্দন।

রাণু আর ভানুর খুশির ব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে রাণু—শুনছ, বাবা?

হেমন্তবাবু—কী রে? বল শুনি!

রাণু—দিদি নিশ্চয়ই আবার গান গাইবে আর ছবি আঁকবে।

হেমন্তবাবু হাসেন, কিন্তু চোখ দুটোও ছলছল করে।—দিদিকে জিজ্ঞাসা কর।

পঙ্গু হেমন্তবাবুর মনের রোগটাও আজ সকাল হতেই একবার খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। চারুবালার ফটোর দিকে তাকিয়ে ছটফট করেছেন আর বিড় বিড় করে কথা বলেছেন—তুমি আজ অন্তত একবার এস আর দেখে যাও। তোমার মেয়ের বিয়ে, কিন্তু তুমি কি আজ এসে একটু দেখবেও না?

প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রী এসে একবার দেখে গেলেন, সুমিতা বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে শুয়ে রয়েছে। একবার খুব গম্ভীর হয়ে, আর-একবার খুব হেসে সুমিতাকে ধমক দিলেন—বোকা মেয়ে, ছি, এরকম করতে নেই। উঠে বসো।

উঠে বসেছে সুমিতা। প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রীর হাত ধরে বলেছে—আপনি কখন আসছেন জেঠিমা? সন্ধ্যা হবার আগেই আসবেন। আমার খুব ভয় করছে, জেঠিমা।

—কোন ভয় নেই। আমি সন্ধ্যে হবার আগেই আসবো। তার আগে মণিকা আসবে। মণিকার বাবা জনার্দনের সঙ্গে স্টেশনে যাবে।

প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রী চলে যাবার পর, পলাশের মাথার উপর বসে একটা কোকিল হঠাৎ যখন ডেকে উঠেছে, ঠিক তখন রঘুর মা ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে আর সুমিতার শান্ত চোখের নিবিড় ও নির্ভয় হাসিটার দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে যায়।

দুহাত দিয়ে দুই কান ছুঁয়ে আর গলার স্বর কাঁপিয়ে কথা বলে রঘুর মা।—এ কী ভয়ানক কথা আজ আমাকে শুনতে হলো! হে ভগবান, ও কথা যেন পাপীর মুখের মিথ্যে কথা হয়।

সুমিতার চোখে দুঃসহ একটা আতঙ্কের ছায়া ছমছম করে।—কী কথা, রঘুর মা?

রঘুর মা—যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই শুনছি, ছেলে নাকি ছোট চাকরি করে। অফিসের আর্দালির কাজ করে। কোথায় ভাবলাম, বেটির আমার রাণীর মত ভাগ্যি হবে! তা না হয়ে···কিন্তু আমার এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রঘুর মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুমিতা। তারপর, দুই চোখ ভাসিয়ে দিয়ে, যেন বুকের ভেতরের সব নিঃশ্বাস ব্যথিত করে, একটা নীরব কান্নার জল উথলে ওঠে। এ যেন সুমিতার ভালবাসার সামান্য আশার প্রাণটারই উপর অসামান্য ও অদ্ভুত একটা নিষ্ঠুরতার তামাশা। ভালবেসে ভুল করেছে সুমিতা, এই ভয়ানক সত্যটাকেই আজ যেন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে, আজকের দুপুরবেলার বীরবাঁধের সব বাতাস আর সব শব্দ। কোকিল নয়, খুব মিষ্টি করে ডাক দিচ্ছে একটা ভয়ানক ঠাট্টা।

কিন্তু চোখ মুছেই ভয়ানক শক্ত হয়ে ওঠে সুমিতার চোখের দৃষ্টিটা। না, আর পরীক্ষার ভয় করে লাভ নেই। অনিমেষ যদি জিজ্ঞাসা করে বসে, তুমি কি আমার সঙ্গে আমার একটা মোটা মাইনের বড় চাকরিকেও ভালবাসতে চেয়েছিলে? এ প্রশ্নের জবাবে

সত্য কথাটা বলতে হলে বলতেই তো হবে—না। তবে আজ হঠাৎ রঘুর মা-র মুখের কথাটা শুনে কেঁদে ফেলবার কী দরকার হলো ?

না, এ কান্নার কোন দরকার নেই। এ কান্নার কোন অর্থ হয় না। কী যেন তাঁর নাম, যার নামে অনেক গল্প বলেছেন বাবা। ফকিরবাবু। আশা-টাশা যা কিছু করতে হয়, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছের কাছে ছেড়ে দিতে হয়। ফকিরবাবু তাঁর মাটির ঘরের দরজার বাইরে বাঘের ডাক শুনেও তাঁর ভজন গান বন্ধ করতেন না। একটুও ভয় পেতেন না।

—ওসব কথা শুনে আমার কোন লাভ নেই, ক্ষতিও নেই, রঘুর মা। হেসে ওঠে সুমিতা। হাসিটা যেন সব ঠাট্টারই উপর একটা কঠোর ঠাট্টার হাসি।

রঘুর মা কিন্তু হাসে না। মাথায় হাত দিয়ে ঘরের মেঝের উপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। রাণু এসে বলে—তুমি যে বলেছিলে রঘুর মা, আজ তুমি রাম-সীতার গান গাইবে। কই, গাইছ না কেন ?

রঘুর মা—গাইবো। একটু জিরিয়ে নিই, তারপর গাইবো।

জিরিয়ে নিতে গিয়ে রঘুর মা যখন ঝিমোতে শুরু করেছে, তখন আর এক অদ্ভুত বিস্ময়ের তামাশার মত পাটনা থেকে সুমিতার নামে লেখা একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল ডাক পিয়ন।

চিঠি লিখেছেন মালতীদি।—আমি আজ এই এক বছর ধরে আশা ধরে বসে আছি, অনিমেষের সঙ্গে আমার শুভাননার বিয়ে দেব। মধুপুরের মনোরমাদি আমার হয়ে এই বিয়ের জন্য এক বছর ধরে চেষ্টা করছেন, কথাবার্তা বলেছেন, চিঠি লিখেছেন। অনিমেষের মামা, রেলওয়ের চ্যাটার্জী সাহেব পাটনাতে এসেছিলেন। তাঁরই কাছে শুনতে পেয়েছেন শুভাননার বাবা, তোমার সঙ্গে অনিমেষের বিয়ে হবে। আমি স্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারিনি যে, তুমি মতলব করে আমার শুভাননার সর্বনাশ করে বসে আছ। তোমারই ফাঁদ, তোমারই জাল, তোমারই লোভ অনিমেষকে বন্দী করেছে। খেতে জোটে না, ষাট টাকা মাইনের চাকরি কর, অনিমেষের মত ছেলেকে

গ্রাস করতে লজ্জা হলো না তোমার? বীরবাঁধে কি একশো টাকা মাইনের কোন স্কুল-মাস্টার ছিল না? বুঝি না, আসানসোলের ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মত এত বড় কনসার্নের অফিস চালায় যে বুদ্ধিমান, হাজার টাকা মাইনের যে ম্যানেজার, সে কেন এত বোকা হয়ে তোমার মত মেয়ের ফাঁদে পড়ে! খুব, আমার স্নেহের খুব প্রতিশোধ তুমি নিলে, সুমিতা!

চিঠি পড়া শেষ হতেই সুমিতার অলস অবশ হাত থেকে চিঠিটা যেন ফসকে পড়ে যায়। বিস্ময়ের আবেশটা সুমিতার ভাবনাটাকেও যেন অবশ অলস করে দিয়ে একটা স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। দৃশ্যটা মনে পড়ছে সুমিতার, ভাসানির স্রোতে চার বছর আগের সেই শাল-মহুয়ার ফুল ভেসে যাচ্ছে।

আর, এক বছর আগের অনিমেষ তার অফিসের ঘরে বসে সুমিতা দত্ত নামে এক অচেনা অজানা মেয়ের দুঃখের চিঠি পড়ছে। এই দৃশ্যটাও যেন দেখতে পাচ্ছে সুমিতা। মেজমামা কাজ করতেন আসানসোলের যে অফিসে, সেটা তো ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অফিস। সেই অফিসের ম্যানেজারের কাছে যে চিঠি লিখতে হয়েছিল এক বছর আগে, সে চিঠি কি···

বাড়িয়ে বলেনি অনিমেষ, ঠাট্টাও করেনি, ঠিকই সুমিতাকে দেখবার আগেই সুমিতাকে চিনে ফেলেছিল অনিমেষ। বাঃ, বেশ মানুষ! সুমিতার সেই চিঠির মধ্যেই কি স্বপ্নের ছবি দেখে ফেলেছিল অনিমেষ?

ডাক দেয় সুমিতা—রঘুর মা।

চমকে ওঠে রঘুর মা—কী?

সুমিতা—তুমি ভুল কথা শুনেছ, মিথ্যে কথা শুনেছ। ভদ্রলোক খুব ভাল চাকরি করেন।

রঘুর মা—ভগবান, ভগবান! কী সুখের কথাই না বললি, বেটি! জিতা রহো বেটি।

বারো

বিকেল পর্যন্ত পলাশতলার লাল শালুর তোরণ হাওয়া লেগে আস্তে আস্তে কেঁপেছে। রঘুর মা-র গলাতে রাম-সীতার গান মাঝে মাঝে বেশ জোরালো স্বরে বেজেছে। বাড়ির ভিতরে একটি আগন্তুক মেয়ের, প্রিয়নাথবাবুর মেয়ে মণিকার হাসির ঝঙ্কার দু'একবার বেজেছে। রাণু আর ভানু মাঝে মাঝে ছুটোছুটি করছে। এছাড়া বীরবাঁধের হেমন্তবাবুর বাড়ির এই শুভ উৎসবের চেহারাতে যা আছে তার সবই হলো এক-একটা নীরব রিক্ততা। কী যে ব্যবস্থা করে গিয়েছে জনার্দন, তা জনার্দনই জানে। একটা একচালার বেড়ার ফাঁক দিয়ে অবশ্য ধোঁয়া বের হয়ে উড়ছে। শুভ উৎসবের তুষ্টির জন্যে কোন্ পরমান্ন রান্না করা হবে, সেটা ওই একজন পাঁড়েজী জানে, যে এখনও অলস হয়ে বসে ঝিমোচ্ছে।

বিকেল হলে পলাশতলার কাছে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে এই রিক্ততার দৃশ্য দেখেছেন, হেসেছেন আর চলে গিয়েছেন তিন ভদ্রলোক, শ্যামবাবু, জিতেনবাবু আর হরনাথ।

কিন্তু সন্ধ্যা হতেই এ কী হয়ে গেল বীরবাঁধের চেহারাটা! বীরবাঁধের সব বাতাস যেন উৎসবের শব্দে মুখর হয়ে হেমন্তবাবুর বাড়ির শুভদিনের এই রিক্ত চেহারাটাকে মাতিয়ে মুখর করে তোলবার জন্য এগিয়ে আসছে। গাড়ি আর গাড়ি, জোড়া হেড-লাইটের আলোর স্রোতে বীরবাঁধের সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ভেসে গেল। গাড়ির হর্নের ব্যাকুল শব্দের বিরাম নেই। এক-একটা গাড়ি যেন খুশি কলরবের এক-একটা ফোয়ারা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কথা বলছেন আর হাসছেন গাড়ির ভদ্রলোকেরা, মেয়েরা আর ছোট ছেলে-মেয়েরা। সাজে-পোশাকে সবাই যেন অনেক রঙীন ও অনেক

দামী সুখের এক-একটি ফুল্ল ছবি। সবার আগের গাড়িতে, কপা
চন্দনের টিপ নিয়ে বসে আছে যে, সে তো···

ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে আর খোলা জানালার গরাদটা শক্ত কা
আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন জিতেনবাবু—আরে, কে ও? আ
এ কী ব্যাপার?

কাঁপছেন জিতেনবাবু, যেন একটা বিভীষিকার মিছিল দেখছেন
তারপরেই খিড়কির দরজা দিয়ে বের হয়ে, আর, যেন একটা আর্তনা
হয়ে ছুটে চলে গেলেন।—কে এই অনিমেষ? জনার্দন মুহুরি
বন্ধু কে এই সাংঘাতিক ধোঁকাটা? ও শ্যামবাবু, কে ও?

শ্যামবাবুর বাড়ির দরজার কাছে এসে ডাকতে থাকেন
জিতেনবাবু।—ও শ্যামবাবু, কিছু বুঝলেন কি? কিছু শুনলেন কি?
কে ও?

শ্যামবাবু—শুনেছি। হিতু চৌধুরী বলে গেল, বর হল আসা
সোলের সেই ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের একটা কারখানার অফি
ম্যানেজার। কথা বলতে গিয়ে শ্যামবাবুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস যে
ডুকরে ওঠে।—কিন্তু এ কী করে হয়?

জিতেনবাবু—আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শ্যামবাবু—চলুন তো একবার, শুনে আসি হরনাথ কী বলে?

শ্যামবাবুর ও জিতেনবাবুর দুই ছায়াকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে
ওঠে হরনাথের ছায়া।—এ কী হলো শ্যামবাবু! এ কী করে হয়?

শ্যামবাবু—আরে মশাই, আমরাও তো সেই কথা জিজ্ঞাসা
করছি।

হরনাথের গলার স্বর খেঁকিয়ে ওঠে।—আমাকে জিজ্ঞাসা কর
কেন? আপনারাই বলুন না, এ কী করে হয়?

শেষ